বেতার বাংলা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন তারেক রহমান

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২ • ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ - ১৩ এপ্রিল ২০২৬

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

সহ-সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
আদনান অভি

মুদ্রণ সংশোধক
মোঃ হাসান সরদার

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েব সাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাক মাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

সম্পাদকীয়

গণআন্দোলনের উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে আবারও গণতন্ত্রের তীরে নোঙর ফেলেছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অস্থির সময় আর অনিশ্চয়তার কুয়াশা ভেদ করে জনগণের কণ্ঠস্বরে বজ্রধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়েছে–রাষ্ট্র হবে জনগণের, শাসন হবে জবাবদিহির, আর ভোট হবে নাগরিক অধিকারের পবিত্র উৎসব। এ ছিল কেবল রাজনৈতিক পালাবদল নয়; ছিল চেতনার জাগরণ, অধিকারবোধের পুনর্জন্ম।

রাজপথে তরুণদের স্লোগান, শিক্ষার্থীদের দৃঢ় পদচারণা, শ্রমজীবী মানুষের নীরব কিন্তু অটল সমর্থন–সব মিলিয়ে এক বহতা স্রোত সৃষ্টি করেছিল জুলাই ২৪। সেই স্রোত কোনো ধ্বংসের জন্য নয়, বরং নির্মাণের জন্য; কোনো প্রতিশোধের জন্য নয়, বরং পুনর্গঠনের প্রত্যয়ে। জনগণের ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে- সার্বভৌম ক্ষমতার ঠিকানা প্রাসাদ নয়, মানুষের হৃদয়। গণতন্ত্রের এই পুনরাগমন তাই কেবল সংবিধানের ধারায় নয়, মানুষের আত্মবিশ্বাসে লিখিত হয়েছে। অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে ব্যালটের প্রতিটি ছাপ হয়ে উঠেছে বিশ্বাসের স্বাক্ষর, প্রত্যাশার আলোকরেখা।

তবে এই অর্জন এক প্রজন্মের সাধনা। গণতন্ত্র লালন করতে হয় সততা, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার চর্চায়। সকল কণ্ঠের মর্যাদা, মুক্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তাই পারে এই নবযাত্রাকে স্থায়িত্ব দিতে।

এই নবগণতান্ত্রিক আবহেই আসছে পবিত্র রমজান, ঈদ ও স্বাধীনতা দিবস। সংযমের মাস শেষে ঈদের চাঁদ উঠবে এমন এক আকাশে, যেখানে মানুষের হৃদয়েও জেগেছে মুক্তির আলো। মসজিদের তাকবির, কোলাকুলির উষ্ণতা আর দান-সদকার মমতায় মানুষ অনুভব করবে–আত্মশুদ্ধির সাধনা যেমন ব্যক্তি-মানুষকে নির্মল করে, তেমনি গণতান্ত্রিক চর্চা শুদ্ধ করে রাষ্ট্রের চেতনাকে। ঈদ যেন স্বচ্ছতার প্রতীক হয়ে স্মরণ করাবে–ক্ষমা, সহমর্মিতা ও ন্যায়ই সামাজিক বন্ধনের আসল শক্তি।

অন্যদিকে স্বাধীনতার প্রভাতে যখন লাল-সবুজ পতাকা উড়বে, তখন তার রঙে মিলেমিশে থাকবে অতীতের ত্যাগ আর বর্তমানের প্রত্যয়। শহীদদের স্বপ্ন, জনগণের আন্দোলন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক আস্থা–সব একসূত্রে গ্রন্থিত হয়ে এক অনন্য উদ্‌যাপনে। এবার উৎসব কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি পরিণত হবে আমাদের আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আজকের বাংলাদেশ আশার প্রদীপ হাতে এগিয়ে চলেছে। গণতন্ত্র, ঈদ ও স্বাধীনতার চেতনা মিলেমিশে তৈরি করবে এক নতুন অধ্যায়। যে জাতি অধিকার রক্ষায় জাগ্রত, তার উৎসবও হয় আলোকিত ও অর্থবহ। আশা, দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার সম্মিলিত শক্তিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যতের পথে।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

সাক্ষাৎকার: বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম ৩

আমার এমন মধুর বাংলা ভাষা - শান্তা মারিয়া ৭

বাংলায় বসন্ত - মোস্তফা তারিকুল আহসান ১২

মুক্তিযুদ্ধের ছোটগল্প: বিকল্প বয়ান - ড. মো. মেহেদী হাসান ২১

রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য - ড. মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী ২৬

অবিশ্বাস্য রেজু চাচা - জি এইচ হাবীব ২৯

ঈদের নামাজ - মো. ওমর ফারুক ৩২

নীলদর্পণ - ইকবাল খোরশেদ ৩৪

আবুল মনসুর আহমেদ পাঠ - কুদরত-ই-গুল ৪০

অনিদ্রা - ডা. এম এ হালিম খান ৪৪

বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৬ - এ এস এম জাহীদ ৪৮

সম্প্রচারের অনুগল্প - দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব ৫০

গল্প

না গৃহ না সন্ন্যাস - রফিকুর রশীদ ১৬

বেতার পর্ব

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৬৫

পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৭৪

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৮৩

বেতার সংবাদ ৯৭

বেতার অ্যালবাম ১০০

তারুণ্যের কণ্ঠ ৫৫

শ্রোতা ও পাঠকের পাতা ১০৫

কবিতা

হাসান হাফিজের কবিতা ৬

অবাধ উচ্চারণের জন্যে আত্মত্যাগ - রেজাউদ্দিন স্টালিন ১১

সূবর্ণ পথের টিকিট - শাহিন রিজভি ১৫

ফাল্গুনে মন প্রকৃতির রূপে - মনসুর আজিজ ২০

বাংলা আমার ভাষা - সোহরাব পাশা ২০

এই দেশ এই মানচিত্র - জামসেদ ওয়াজেদ ২৫

নির্জনবিন্দু - মহসিন আহমেদ ২৫

স্বাধীনতার হিসেব নিকেশ - জিন্নাত আরা ইফা ২৮

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুর - মোখলেছা খাতুন ৩৯

কেউ একজন ছিল - ফখরুল করিম ৪৩

অপেক্ষা - মাজহারুল ইসলাম ৪৩

একুশের কবিতা - পারভেজ বাবুল ৪৭

তরুপল্লব

পতাকার মান - আবু তৈয়ব মুছা ৫৯

মায়ের ভাষা - কৃষ্ণ কর্মকার কৌশিক ৫৯

মাতৃভাষা - হাফিয রেদওয়ান ৫৯

ষড়ঋতু - ইসতিয়াক আহমেদ তৌফিক ৬০

ঈদ আনন্দ - শামীমা জান্নাত শিউলী ৬০

টুনুর টেলিস্কোপ - জুয়েল আশরাফ ৬১

ভাষার দাবি - নাজীর হুসাইন খান ৬২

দাদুর পতাকা - শাকিব হুসাইন ৬৩

একুশ মানে - কাজল নিশি ৬৪

স্বাধীনতা - এম. আলমগীর হোসেন ৬৪

‘বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের পরিণতি হিসেবে’

ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও এর সমসাময়িক তাৎপর্য বিষয়ে কথা বলেছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক

অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন **সজীব দত্ত**।

সজীব দত্ত : ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোহাম্মদ আজম : ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা, এটা তো আমাদের এখানে খুবই প্রতিষ্ঠিত ধারণা, যে জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তার প্রথম বড় ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনের আগে থেকেই নিশ্চয় এ ধরনের চিন্তাভাবনা সমাজে ছিল। কিন্তু একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার যে জনবিরোধী অবস্থান এবং নির্দিষ্ট করে বললে পূর্ব পাকিস্তান, তখন আসলে পূর্ব বাংলাই বলত। পূর্ব পাকিস্তান নামটা হয়েছে পরে সংবিধান যখন প্রণীত হয়েছে তখন।

তো পূর্ব বাংলার ব্যাপারে এই রাষ্ট্রেও, পাকিস্তান রাষ্ট্রের এক ধরনের বিরোধী বা বিমাতা সুলভ মনোভাব এগুলোর কারণে আসলে ৫২ সালে ভাষা আন্দোলন খুব জোরালো হয়েছে এবং এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছে। এবং এরপরে প্রায় দুই দশক ধরে ওই ব্যাপারটা নানানভাবে চর্চিত হয়েছে বর্ধিত হয়েছে। তার সঙ্গে রাজনৈতিকতার নানান ধরনের সংশ্লেষ ঘটেছে এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ফলে যে বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পেয়েছি সেটার সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে সম্পর্কিত। আমরা বলব যে কোনো কোনো অর্থে কার্যকারণ সূত্রে সম্পর্কিত।

সজীব দত্ত : তরুণ প্রজন্ম কীভাবে দেখছে?

মোহাম্মদ আজম : একটা ব্যাপার হলো যে– অতীতে যখন কোনো ঘটনা ঘটে এবং তা জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত হয় এবং সেটার ঘটনাপ্রবাহ যখন পরবর্তীকালে মানুষ ভাবে, স্মরণ করে– তখন তার মধ্যে একটা মিথিক্যাল বা পৌরাণিক চরিত্র জন্মায়। মিথিক্যাল বা পৌরাণিক চরিত্র হলো যেটা আমাদের বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ওটা খুবই দূরবর্তী, খুবই মহান, খুবই অস্পর্শনীয় এরকম একটা জিনিস। এটা সাধারণত সব জাতিরই থাকে। আমাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপারে এরকম একটা পৌরাণিক চরিত্রে দাঁড়ায়। একটা দূরবর্তী, খুবই শ্রদ্ধেয়, খুবই উঁচুতে, কিন্তু এটা এখন আর লিভিং নয় এমন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে জনজীবনের জন্য অত্যন্ত খারাপ। এটা অনেক সময় এড়ানো যায় না। মানুষের জীবনে ইতিহাসের বা অতীতের ওই ঘটনাগুলোই খুবই তাৎপর্যবহ হয়ে জীবন্ত হয়ে থেকে যায় যেগুলো প্রাত্যহিক জীবনে নানাভাবে চর্চার অঙ্গীভূত হয়।

ধরা যাক, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রধান স্বপ্ন ছিল মুক্তি। এটা বানানো কথা নয়। এটা মানুষ অনবরত বলেছে, সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে। কিন্তু এখন মুক্তির প্রকল্প বাদ দিয়ে শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রসঙ্গকে আমরা দূরবর্তী বিরাট অর্জন এবং মহান হিসেবে ধরি, তাহলে কিন্তু তার তাৎপর্য কমে যায় এবং এখনকার দিনের যে প্রাসঙ্গিকতা, সেটা কমে যায়। ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলনেরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল– 'রাষ্ট্রভাষা' আন্দোলন। এই কথাটা খুব বেশি পরিমাণে যে আমরা মনে রাখতে পেরেছি তার লক্ষণ পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রভাষা একটা বড় ধারণা, জরুরি ধারণা। সে ধারণা হলো সাধারণ মানুষের ভাষায় রাষ্ট্র চলবে। এটা প্রধানত ভাষাপ্রেমের ব্যাপার নয়। ভাষাকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপার নয়। এটা প্রধানত শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা নয়। এটা হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে জনমানুষের সম্পর্কিত হওয়ার একটা প্রস্তাব, একটা প্রতীক এবং একই সঙ্গে একটা উপায়। ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যে এই প্রস্তাবটা ছিল যে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হবে, রাষ্ট্র জনাবদ্ধব হবে এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হয়, গত কয়েক দশক ধরে আমরা আমাদের চিন্তাভাবনায়, প্রচারে, উচ্চারণে, রাষ্ট্রকাঠামোয় এবং সেটার প্রতিফলনে আমরা এই জিনিসটা মনে রাখতে পারিনি।

আবার পরবর্তীকালে আমরা এটাকে করেছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাতৃভাষা দিবস করার মধ্য দিয়ে ওই 'রাষ্ট্রভাষা' প্রকল্পটা একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। কখনো কখনো মনে হয় যে রাষ্ট্র আর এটাকে খুব বেশি সম্বোধন করছে না। বুদ্ধিজীবীরা করছে না, প্রচার মাধ্যমেও রাষ্ট্রভাষা প্রকল্পটা কোণঠাসা হয়ে গেছে। আবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের নতুন যেসব তাৎপর্য আছে সেগুলোও যে খুব ভালোভাবে আমরা সামনে এনেছি তা নয়। যেমন ধরা যাক, বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও অন্তত ৪০টা বা তারও বেশি মাতৃভাষা আছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই ভাষাগুলোতে কথা বলে। কিন্তু আমরা যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিংবা আলাপ-আলোচনায় কিংবা উচ্চারণে কিংবা অভিব্যক্তিতে এই মাতৃভাষাগুলোকে খুব বেশি পরিমাণে রাষ্ট্রের মূলধারায় কিংবা চর্চার মধ্য রাখতে পেরেছি বা রাখতে চাই তার লক্ষণও খুব একটা দেখা যায় না। তার মানে আমার বক্তব্যটা হলো– খুবই মহান নানান ব্যাপার আছে এবং এগুলোকে যদি আমরা আলংকারিকভাবে নিই এবং অনবরত উচ্চারণ করতে থাকি, তাহলে সেটাতে কাজ চলে, কিন্তু সেটা আসলে আমাদের রাষ্ট্রে কিংবা জনজীবনে, রাজনীতিতে কিংবা ভবিষ্যতের পথে আমাদের যে তৎপরতা সেগুলোতে খুব একটা কার্যকর হয় না। আমি এখনকার প্রজন্ম কে বলব, ইতিহাসকে বা অতীতের ঘটনাকে শুধু একটা দূরবর্তী আলোকবর্তিকা হিসেবে না দেখে এর সমসাময়িক যে তাৎপর্য, সেটার নিরিখে আবিষ্কার করার একটা প্রয়াস আমাদের থাকা উচিত।

সজীব দত্ত : বাংলা একাডেমি ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা নিয়ে কী ধরনের কাজ করছে?

মোহাম্মদ আজম : বাংলা একাডেমি এ ব্যাপারে স্বভাবতই বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। এখানেই একুশের সবচেয়ে ভালো সংকলন হয়েছে। এখানেই একুশ উদ্‌যাপনের ব্যাপারে প্রচুর অনুষ্ঠান করা, আলোচনা করা, প্রকাশনাসহ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কিত করে ইতিহাস পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। অনবরত বই প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারগুলো মিলিয়ে বাংলা একাডেমি আসলে গত ৭০ বছর ধরে প্রায় বিস্ময়কর পরিমাণ লিটারেচার উৎপাদন করেছে। এটাই হওয়ার কথা। কারণ আমরা সবাই জানি, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের পরিণতি হিসেবে। ওই ভাষা আন্দোলনের ২১ তারিখকে স্মরণ করেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা হয়েছিল। এবং ২১ দফা অনুযায়ীই আসলে ৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। বিপুল পরিমাণ কাজ বাংলা একাডেমি করেছে এবং প্রতিবছর করে যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি মাস বিশেষভাবে ভাষাকে স্মরণ করার মাস। পুরোনো ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করার মাস। এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের যে চেতনা তৈরি হয়, এই চর্চার মধ্য দিয়ে যে সচেতনতা তৈরি হয়, সেটা যেন বছরের বাকি সময়টাতেও অক্ষুণ্ন থাকে, অব্যাহত থাকে। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যেটা বলব সেটা হলো যে– ভাষা প্রসঙ্গটা, রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটা, ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গটা, স্বাধীনতার প্রসঙ্গটা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে সম্পর্কিত

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা একাডেমির কাজ ও তৎপরতা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে আরো বড় অর্থে, আলাদা অর্থে ও বৃহৎ অর্থে সম্পর্কিত। সে সম্পর্কটা হলো বাংলা ভাষার ব্যবহার। বাংলা ভাষার ব্যবহার বলতে আমরা কী বুঝি? কোন ভাষার উত্তম ব্যবহার হয় তিন জায়গায়। সেগুলো হলো– উচ্চশিক্ষায়, রাষ্ট্রের কাজে অর্থাৎ আইনি কাজে। আর একটি হলো অফিস-আদালতে। এ তিনটি হলো ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার, যেখানে ব্যবহৃত হলে একটি ভাষা মর্যাদাসম্পন্ন হয়, সমৃদ্ধ হয় এবং একটি ভাষার কর্মক্ষমতা বাড়ে। বাংলার ক্ষেত্রে এই তিনটির কেনোটাই খুব ভালোভাবে হয়নি। খুব সামান্য পরিমাণে হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উচ্চশিক্ষায় বাংলার ব্যবহার। কারণ উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার করলেই ভাষাটা বিভিন্ন প্রকৃত কাজে, গবেষণার কাজে এবং জ্ঞানচর্চার কাজে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ওই পরিমাণ উন্নতি ঘটে যে পরিমাণ উন্নতির জন্য পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বাংলা একাডেমি এই জায়গায় কাজ করে থাকে। আমি বলব না, খুব সফল হয়েছে। বাংলা একাডেমির সাফল্য নিশ্চয় বাংলাদেশের অন্য দশ এলাকার সাফল্যের চেয়ে বেশি হতে পারে না। কিন্তু বাংলা একাডেমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অতীতে। তা হলো পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ের মাধ্যমে এবং প্রমিত ভাষার বিচিত্র রকম সংজ্ঞায়ন এবং নিশ্চায়নের মাধ্যমে। এগুলো একাডেমির কাজ এবং বাংলা একাডেমি এটা করছে। তবে এই ব্যাপারে প্রয়োজন আরো বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং বাংলা একাডেমির সেটা প্রয়োগ করা। এটা সম্ভব এবং করতে হবে– যা করছে তা যথেষ্ট নয়।

সজীব দত্ত : ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা নিয়ে যাঁরা লিখছেন, বিশেষ করে তরুণ লেখক ও গবেষকদের জন্য বাংলা একাডেমির ভূমিকা সম্পর্কে বলুন।

মোহাম্মদ আজম : প্রকাশনার দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে বাংলা একাডেমি তাঁদের পাশে আছে। তা না হলে তো এত বই প্রকাশিত হতো না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যেটা আমি আগেই বলেছি যে আমাদের মিথের পুনরুৎপাদন কিংবা অতীতের কোনো একটি আলোকবর্তিকার পুনরুৎপাদন অনবরত করা, যেটা আমাদের এখানে লেখালেখির ক্ষেত্রে বেশির ভাগ হয়ে থাকে, এটা কোনো কাজের কথা নয় আসলে। যেটা উচিত সেটা হলো ইতিহাস পড়ার, অতীতকে পড়ার কিংবা সমাজকে বিশ্লেষণ করা এবং এগুলোর মাধ্যমে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপন করার অসংখ্য ধরনের পদ্ধতি আছে। এর নানান ধরনের জ্ঞানতত্ত্ব আছে। এবং সেটা আগে যেরকম ছিল এখন সেরকম নেই সারা পৃথিবীতে, বদলেছে। ওই নতুন নতুন জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে পদ্ধতিমাফিক গবেষণার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহলে তা ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার প্রতি একদিকে সর্বোত্তম শ্রদ্ধা হবে, অন্যদিকে নতুন সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে এবং আজকের দিনের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে প্রাসঙ্গিকও হবে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বাংলাদেশের এই ধরনের একাডেমিক চর্চা খুব দুর্বল এবং স্বভাবতই বাংলা একাডেমি থেকে যে বিপুল পরিমাণ বই বেরিয়েছে সেগুলোর মধ্যে নতুনত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনার সংখ্যাও খুব কম।

ইদানীং আমাদের অনেকগুলো বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে প্রবন্ধ লেখার জন্য আমরা বৃত্তি দিয়ে থাকি এবং বাৎসরিক গবেষণার জন্য বৃত্তি দিয়ে থাকি। এগুলো নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব কেউ যদি উত্থাপন করে, তাহলে নিশ্চয় এখানে সুযোগ হতে পারে। বাংলা একাডেমির আরেকটা ব্যাপার হলো প্রায় আটটা পত্রিকা বের করে। এগুলোর মধ্যে দিয়েও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

ভাষার মাসকে সামনে রেখে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ফেব্রুয়ারি মাস বিশেষভাবে ভাষাকে স্মরণ করার মাস। পুরোনো ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করার মাস। এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের যে চেতনা তৈরি হয়, এই চর্চার মধ্য দিয়ে যে সচেতনতা তৈরি হয়, সেটা যেন বছরের বাকি সময়টাতেও অক্ষুণ্ন থাকে, অব্যাহত থাকে। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যেটা বলব সেটা হলো যে– ভাষা প্রসঙ্গটা, রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটা, ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গটা, স্বাধীনতার প্রসঙ্গটা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে সম্পর্কিত। আমরা যেন এই পুরো ব্যাপারগুলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে, বাস্তবতার সঙ্গে মিশিয়ে দেখতে শিখি। ধন্যবাদ।

হাসান হাফিজের কবিতা

রক্তবীজে স্বাধীনতা ফুল

স্বাধীনতা পেতে হলে
লাখো প্রাণ বলিদান
দিতে হয়
অজস্র হিমেল মৃত্যু
তার ঘন আলিঙ্গনে

জীবনের থমকে পড়া, অবসান চির অবসান
মৃত্যুবীজ থেকে
জীবনের সমুত্থান পুনরায়
লাখো করোটির মূল্যে
এক নদী রক্ত বিনিময়ে

স্বাধীনতা অতীব মহার্ঘ তুমি, তোমার অমোঘ দাবি
প্রাণ ছাড়া রক্ত ব্যতিরেকে
কোনও দিনই স্বতঃস্ফূর্ত মহিমায়
ফুটতে জানো না তুমি শেখোনি কখনো

স্বাধীনতা স্বপ্নিল আবেশ

রুখে দাঁড়ানোর শক্তি
জ্বলে উঠবার মতো দুঃসাহস
তন্দ্রা ছিঁড়ে লালবর্ণ জাগরণ
লড়াই করবার মতো কঠিন প্রত্যয়
জয়ের তৃষ্ণায় তপ্ত
মৃত্যুপণ শপথে শাণিত
আকাঙ্ক্ষার নামই স্বাধীনতা
ভালোবাসবার স্পর্ধা
শৃঙ্খল ভাঙার মতো অগ্নিক্রোধ
আঁধার পাহাড় বিঘ্ন পাথর সরিয়ে
লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন বেড়াজাল
দুমড়ে মুচড়ে
ছিঁড়েখুঁড়ে
উড়িয়ে দেবার তেজি দৃঢ়তা অটল
প্রতিবাদে প্রতিরোধে
প্রতিশোধে জিগীষায়
অনন্য সে আগুনের অনির্বাণ শিখা
চিরঞ্জীব জাগরূক সত্তা যে অনড়
তোমার তুলনা তুমি স্বাধীনতা
মুক্তির দীপিত ছটা অসহ্য সুন্দর
আকাশের মতো তুমি শাশ্বত মহান
স্বপ্নতোয়া আবেশে আবেগ তুমি
রক্তফোঁটা চাঁদোয়ার প্রিয় স্বাধীনতা॥

আমার এমন মধুর বাংলা ভাষা

শান্তা মারিয়া

মহান ভাষা আন্দোলন এবং অমর একুশ বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষাভাষীর জীবনে পরম গৌরবের স্মৃতিবাহী। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে রাজপথে রক্তের আলপনা এঁকে দেন এ দেশের বীর সন্তানরা। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এমন ত্যাগ স্বীকারের ইতিহাস বিশ্বে আর নেই।

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার এই মহান ভাষা আন্দোলনের রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। দুই শ বছরের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম যতই দানা বাঁধছিল ততই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে প্রশ্নটিও উত্থাপিত হচ্ছিল। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সুনিশ্চিত হয়ে যায় তখন থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে নিয়ে পণ্ডিতমহলে ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বলেন, হিন্দি যেমন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে তেমনি উর্দুকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

এর দাঁতভাঙা জবাব দেন বাঙালি ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দুভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিত বটে।'

১৯৪৭ সালের ৩ আগস্ট মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কমরেড পত্রিকায় ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসেবে অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁর এই প্রবন্ধটি ছাত্রজনতার মধ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

সে সময়ই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলেন 'বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে।' আরেকটি প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে বলেন, 'ইহা জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না'।

১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর পরপরই রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়ায়। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন অধ্যাপক ও ছাত্রের উদ্যোগে তমুদ্দুন মজলিস নামে একটি সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন নূরুল হক ভুঁইয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম।

সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখে তমুদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এর শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' এই পুস্তিকাটিতে শিক্ষার বাহন, অফিস, আদালত ও সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার দাবি তুলে ধরা হয়। তমুদ্দুন মজলিসের এই ছোট্ট বইটি ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাশেমসহ শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা বাংলার সপক্ষে যুক্তি দিতে থাকেন। তমুদ্দুন মজলিসের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির অনেক কর্মী জড়িত ছিলেন। বামপন্থি এই ছাত্রনেতারা তাদের রাজনৈতিক পরিচয় গোপন রেখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সাধারণ ছাত্রদের সংগঠিত করতে থাকেন। ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার, নাদেরা বেগম, মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ, আবদুল মতিন, মমতাজ বেগম, গাজীউল হক প্রমুখ।

এদিকে উর্দু ভাষাকে বাংলার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষেও কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের সে সময়কার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাবিদদের নিয়ে এ সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পাকিস্তানের প্রাদেশিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাপিয়ে দেওয়া। বাংলার বিপক্ষে এই শিক্ষা সম্মেলন ছিল বেশ জটিল একটি ষড়যন্ত্রের অংশ। শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশে (পূর্ব পাকিস্তানসহ) শিক্ষার মাধ্যম ঘোষণা করা হয়। তার মানে বাংলাদেশের স্কুলে কলেজে সর্বত্র উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অযৌক্তিক ও স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেটে পড়ে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ জনগণ।

গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ হরতাল ডাকে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ তারিখে। গণপরিষদের ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলা বাদ দিয়ে উর্দু রাখার প্রতিবাদস্বরূপ এই হরতাল ডাকা হয়।

২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে– বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভার আয়োজন করা হলো। সেই জনসভায় পাকিস্তানের কায়েদে আজম (জাতির পিতা) মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ বললেন, 'উর্দু অ্যান্ড ওনলি উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান' (উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা)। এই কথা শোনামাত্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে উপস্থিত জনতা। তৎক্ষণাৎ চারিদিক থেকে ধ্বনি ওঠে 'না না না'। প্রতিবাদে কেঁপে ওঠে রেসকোর্স ময়দান

১১ মার্চে ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে গণবিক্ষোভ ও মিছিল হয়। সে সময় অনেকে গ্রেফতার হন।

১১ মার্চের আন্দোলনে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১২ থেকে ১৫ মার্চ পূর্ব বাংলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। লাগাতার আন্দোলনের মুখে সরকার ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আপসরফায় যেতে সম্মত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি, রাজবন্দিদের মুক্তিসহ আটটি শর্ত ছিল।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকা সফরে আসেন মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ। এটি ছিল '৪৭-এর দেশভাগের পর তার প্রথম ঢাকা সফর। ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে– বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভার আয়োজন করা হলো। সেই জনসভায় পাকিস্তানের কায়েদে আজম (জাতির পিতা) মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ বললেন, 'উর্দু অ্যান্ড ওনলি উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান' (উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা)। এই কথা শোনামাত্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে উপস্থিত জনতা। তৎক্ষণাৎ চারিদিক থেকে ধ্বনি ওঠে 'না না না'। প্রতিবাদে কেঁপে ওঠে রেসকোর্স ময়দান। অনুষ্ঠানটি রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জিন্নাহর বক্তব্য এবং ছাত্র-জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর পৌঁছে যায় বাংলার ঘরে ঘরে। সেদিনের ব্যাপক প্রতিবাদের পরও আরেকটি জনসভায় আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেটি ছিল ২৪ মার্চ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে চ্যান্সেলর হিসেবে আসেন মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ। সেদিনও তিনি ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেদিনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। 'না না' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। এইসব প্রতিবাদের মুখে ঢাকা ত্যাগ করেন জিন্নাহ।

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর মৃত্যু হয়। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন খাজা নাজিমুদ্দিন। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী। খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ সাল থেকে ৫১ পর্যন্ত পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বরেই পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন নুরুল আমিন। পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার জনগণও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে অটল থাকে। ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮। করাচি। পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে ভাষাসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ওঠে। বলা হয় গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের বক্তব্য রাখতে হবে উর্দু অথবা ইংরেজি ভাষায়। প্রতিবাদে গর্জে ওঠে একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর বাঙালি রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের।

আইনজীবী, সমাজকর্মী ও রাজনীতিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের সভায় পরিষদ সদস্যদের উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষই পূর্ব পাকিস্তানের, যাদের মাতৃভাষা বাংলা।' তিনি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' বা যোগাযোগের ভাষা বলে ঘোষণার জন্যও বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন করেন।

১৯৫২ সালে বছরের শুরুতেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার ন্যায্য দাবি আবার সামনে চলে আসে। আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত তুঙ্গে ওঠে। প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, গাজীউল হক, আহমদ রফিক, মাহবুব আলমসহ অনেকে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জনসভা এবং ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই ঢাকাসহ সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ৪ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার সকল স্কুল কলেজে ধর্মঘট ডাকা হয়। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা এবং আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা এই দুই বিষয়ের প্রতিবাদেই ডাকা হয় ধর্মঘট।

যদিও হরতাল ডাকা হয়েছিল শুধু ঢাকায়, কিন্তু ৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশের স্কুল কলেজগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির অফিস, ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস ঘোষণা করা হয়। পতাকা দিবসকে সামনে রেখে আরো নতুন নতুন কর্মী ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। মেয়েরা পোস্টার লেখার দায়িত্ব নেন। তাঁরা প্রায় ৫০০ পোস্টার লিখেছিলেন। শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিক্ষোভ মিছিল, আন্দোলন চলতে থাকে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ একুশে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ওইদিন ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল আহ্বান করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো ওই দিন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। যদিও গবেষক বশীর আল্‌হেলাল লিখেছেন বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল ২০ ফেব্রুয়ারি।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের একাংশ) আমতলায় ছাত্রদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের। চার জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসতে থাকেন। শুরু হয় লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল নিক্ষেপসহ পুলিশি হামলা। মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্র-জনতার নিরস্ত্র মিছিলে অতর্কিতে গুলি চালায় পুলিশ। শহিদ হন আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবদুস সালাম, আবদুল জব্বার, সালাহউদ্দীন এবং অহিউল্লাহ নামে এক কিশোরসহ আরো অনেকে। পুলিশ অনেক শহিদের মৃতদেহ গুম করে ফেলে। ভাষা আন্দোলনে ২২ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন আউয়াল এবং এক কিশোরসহ আরো কয়েক জন। পুলিশ লাশ সরিয়ে ফেলায় তাঁদের নাম জানা যায়নি।

এই হত্যার প্রতিবাদে সারা পূর্ব বাংলা বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতার প্রবল দাবি ও প্রতিবাদের কারণে বাংলা ভাষা পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। শহিদ দিবস হিসেবে পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে ২১শে ফেব্রুয়ারি।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেসকোর প্যারিস অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোতে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হতে থাকে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলন কি সত্যিই শেষ হয়েছে?

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মনোভাব থেকে আমরা যেন এখনো মুক্ত হতে পারিনি। শত শত বছর ধরে ভিনদেশি প্রভুদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থেকে আমরা বাংলা ভাষার সম্পদ এবং সম্ভাবনা বিষয়ে উদাসীনতা একরকম মজ্জাগত করে ফেলেছি। বাংলায় দুর্বলতা প্রকাশ করতে এবং বাংলার চেয়ে অন্য ভাষায় বেশি দক্ষ এটা প্রমাণ করতে পারলেই যেন আমাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আজ পর্যন্ত কোনো ইংরেজ বা ফরাসি বা জার্মান মানুষ নিজেকে মাতৃভাষার চেয়ে অন্য ভাষায় বেশি দক্ষ– এ কথা বলে গৌরব প্রকাশ করেননি। অথচ বাংলাভাষীরা যেন নিজেই নিজের ভাষাকে অসম্মান করতে পারলে নিজেকে প্রভুশ্রেণির মানুষ বলে মনে করতে থাকেন। শুধু অন্য ভাষার প্রতি প্রেমই নয়, নিজের ভাষাটাকে যে শুদ্ধভাবে বলার ও লেখার জন্য পরিশ্রম করা প্রয়োজন, সেটাও আমরা অনুভব করি না।

কত শতাংশ বাংলাভাষী প্রমিত উচ্চারণে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন? কতজন সঠিকভাবে বাংলা লিখতে পারেন? কতজন সঠিক শব্দ প্রয়োগ করতে পারেন? স্কুলে কলেজে বাংলার শিক্ষকরাও তো অনেক সময় প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারেন না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের সময় তিনি সঠিকভাবে বাংলা বলতে ও লিখতে পারেন কি না– সে বিষয়টিতে অনেক বেশি লক্ষ রাখা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অনেক শিক্ষকের বাংলা ভাষাও আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু এদিকে যেন আমাদের কারো কোনো লক্ষই নেই।

অথচ বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি ভাষা। বাংলা ভাষার রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য ও ইতিহাস। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার বিভাগ রয়েছে। চীনের ছয় থেকে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় 'মেজর' নিয়ে অনার্স করার সুযোগ রয়েছে। ইউরোপের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ দরকার বলে বোধ করছি। বিশ্ব জুড়ে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষার 'মান পরীক্ষা' প্রচলিত আছে। যেমন ইংরেজির মান পরীক্ষার জন্য আইইএলটিএস, চীনা ভাষার জন্য এইচএসকে ইত্যাদি। এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ভিন্নভাষীর ওই ভাষায় দক্ষতার মান যাচাই করা যায়। কিন্তু বিদেশিদের জন্য বাংলা ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের এমন কোনো মান পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। এ ধরনের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার গ্রহণ করতে পারে। করতে পারে বাংলা একাডেমি।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারই চূড়ান্ত হওয়া উচিত।

বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি জানা ছেলেমেয়ে ছাড়া চাকরিই পায় না কেউ। আবার বিদেশ থেকে বিদেশি নাগরিকদের আমাদের দেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি দিয়ে আনা হয় এই কারণ দেখিয়ে যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা নাকি ইংরেজি ভালো জানে না। তাহলে কী দাঁড়ালো? আমাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজিও জানে না, বাংলাও জানে না।

চীনে দেখেছি বড় বড় চিকিৎসক, বিজ্ঞানীরা ইংরেজিই জানেন না। ব্যবসায়ীরা তো জানেনই না। তারা কি দেশ চালাচ্ছেন না? ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগের যেখানে প্রয়োজন, সেখানে তারা দোভাষীর সাহায্য নেন। এতে অনেক তরুণ-তরুণীর উপার্জনের পথও খুলে যায়।

আমি বাংলাদেশিদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিরোধী নই। আমি মনে করি, বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাই ভালোভাবে গ্রহণ করা দরকার। ইংরেজি জানলে বাংলা জানা যাবে না, এমন তো নয়। তবে প্রথমে মাতৃভাষার চর্চা ও তারপর অন্য ভাষা।

সবচেয়ে বেশি দরকার নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার। আমরা যেন বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা নিয়ে সব সময় গৌরব বোধ করতে পারি। এ বিষয়ে কাজ করতে পারি। এজন্য যেমন সরকারের উদ্যোগ দরকার তেমনি দরকার প্রতিটি বাংলাদেশির ইতিবাচক মনোভাব। দিন শেষে আমার ভাষা, আমার দেশ, আমার সংস্কৃতিই আমার পরিচয়, আমার ঠিকানা।

লেখক : সাহিত্যিক ও অধ্যাপক, ইউননান বিশ্ববিদ্যালয়, চীন

অবাধ উচ্চারণের জন্যে আত্মত্যাগ

রেজাউদ্দিন স্টালিন

প্রথম শর্ত হলো অবাধ এক উচ্চারণের জন্যে আত্মত্যাগ
'স্বাধীনতা' এই ধ্বনি যা জিহ্বার আন্দোলন থেকে
সংক্রমিত হতে থাকে সমুদ্রস্বরের মতো গ্রাম এবং শহরে
কিন্তু ক্রমাগত রক্তচোখের দেয়ালে বাঁধা পেতে থাকে সেই উচ্চারণ
একুশ শতকেও কারাগার হয়ে ওঠে প্রবঞ্চকদের গবেষণাগার
আর বছরগুলো গড়িয়ে যায় আমার প্রতিরোধপ্রবণ বাহুর মধ্যে
আর হাজার হাজার নক্ষত্রের মতো সম্পাদিত হতে থাকে
আমার দিনপঞ্জীর প্রকাশনা-

যেখানে মৌমাছির গুঞ্জরণ আর ধানশীষের সংবাদও বিরল নয়
বিরল নয় নদীর কল্লোল এবং গাঙচিলের চিৎকার, কুয়াশা ভেজা
কৃষকের পায়ের শব্দ, বন্দী পিতার জন্যে অপেক্ষাতুর শিশুর
চোখের জলের নিরবচ্ছিন্ন নদী, সম্রাটদের পলায়ন,
মুদি দোকানীর হাঁক ডাক কিংবা শেয়ার বাজারের ওঠা নামাও

দ্বিতীয় শর্ত হলো বিজয় সাফল্যে ভরা সৌন্দর্যের আন্দোলন
সৌন্দর্য অর্থাৎ বসন্তের উৎসর্গ পত্রে লেখা ভালোবাসা-
যারা ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নেবার দায় থেকে-
মুক্তিযুদ্ধের ওয়াগনে চড়ে তারা এশিয়ার উপকূলে সূর্যাস্তের
জলন্ত কয়লার সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করুক গুপ্ত শিকারীর সতর্কতা
দেখুক অন্ধকারে বন বেড়ালের চোখের আগুন অথবা পাঠ করুক
ক্ষার তুষারের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আমার কবিতা

তৃতীর শর্ত হলো খুব এক শপথের হীরে বসানো মুকুট খুঁজতে
বেরিয়ে পড়া; সোনালী লতার চুমকি বসানো পথে ট্রাফিক খরগোশের
সিগন্যাল সরিয়ে কাঠবিড়ালীর মতো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
অনুসন্ধান- আর তার জন্যে চাই তিতুমীর কিংবা ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ
যাদের স্বচ্ছতোয়া চোখের ভেতর সমগ্র বাংলাদেশ স্নান সেরে শুদ্ধ হতে পারে
সত্যিকার অর্থে তৃতীয় শর্তই হলো জরদগব উত্তরাধিকার
জলন্ত জেরেনিয়ামের মতো উজ্জ্বল সারাৎসার, তামা দস্তা রুপো
আর ইস্পাতের পাতে তৈরী
ফুসফুসের মৌচাক ঘিরে আবর্তিত শর্তসমূহ একবার বিশেষ্যে
এবং আরেকবার বিশেষণে রূপবদল করেই আমাদের পথ পেরুতে হবে
প্রস্তুতি নিতে হবে পিঁপড়ের নিঃশব্দ যাত্রার মতো, আমার বিশ্বাস
সোনা বাঁধানো মুকুটটি পাওয়া যাবে কোনো উইঢিবি
অথবা ইঁদুরের গর্তের মধ্যে এবং তখন সময় থাকবে
আশ্চর্য গোলাপী ঋতু- বসন্ত

বাংলায় বসন্ত: সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংযোগ

মোস্তফা তারিকুল আহসান

বাঙালির জীবনে ঋতুর প্রভাব যে কত গভীর তা বর্ণনা করা সহজ নয়; এক শাশ্বত জীবনধারার সঙ্গে এর সংযোগ আর সেই সংযোগ আমাদের ঐতিহ্যকে শক্তিমান করে সব সময়। আপাতভাবে মনে হতে পারে প্রকৃতির নানা ধারা বা ঋতুর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক তেমন গভীর নয় : বিশেষত নগরজীবনের যে ব্যস্ততা সেখানে ষড়ঋতুর পরিক্রমা উপলব্ধি করার সময় থাকার কথা নয়। আবার একধরনের বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে বাংলার ঋতুকেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক উৎসব তা টিকিয়ে রেখেছে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান মানুষেরা। তবে বাস্তবতা হলো ঋতুকেন্দ্রিক যে আয়োজন বা চঞ্চলতা তার শেকড় মানুষের মনের অনেক গভীরে। আমাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় বড় ভূমিকা রাখে সাংস্কৃতিক এইসব উদ্‌যাপন যা প্রত্যক্ষ করা যায় নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আর এর মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে এবং আমাদের সামগ্রিক জাতীয়তার স্মারক আমরা এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি। আমরা লক্ষ্য করি যে নববর্ষ, বসন্ত বা পৌষপার্বণে যে উৎসব হয় তাতে সর্বসাধারণ মিশে যায় একাকার হয়ে, সবাই অংশগ্রহণ করে, ধর্ম বর্ণ গোত্রের বাইরে গিয়ে। এক অসাম্প্রদায়িক আনন্দময় উদ্‌যাপন আমাদেরকে প্রাণিত করে যার মূল উদ্দেশ্য থাকে সবার সঙ্গে মিলে যাওয়া। এই আনন্দ-উৎসবে সবার সঙ্গে মিলিত হবার যে সংস্কৃতি তা আমাদের শাশ্বত জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ষড়ঋতুর বাংলাদেশ যেভাবে তার একেকটা রূপ আমাদের সামনে প্রতিভাত করে তা উপলব্ধি করা বা সেই রূপের অবগাহন করা আমাদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির অংশ। বাংলার সাহিত্যিকেরা বিশেষত কবিরা তাঁদের কবিতা ও গানে নানা ঋতুর যে বর্ণনা করেছেন তা পাঠ করেই আমরা ঋতুর রূপবৈচিত্র্য অনুভব করি তা সব সময় সঠিক নয়, তবে তারা আমাদেরকে প্রণোদিত করেন গভীরভাবে সেটিও সত্য। প্রতিটি ঋতুর সৌন্দর্য স্বতন্ত্র। তবে বসন্ত, সন্দেহ নেই, সবার চেয়ে আলাদা। একে বলা হয় ঋতুরাজ। ঋতুরাজ বলার নেপথ্যে যথেষ্ট কারণ আছে, এই উপাধি আবেগ থেকে দেওয়া হয়নি বরং বসন্তে বাংলা যেভাবে ফুলে ফলে রঙে বর্ণে বিভাসিত হয়, বিচিত্র রঙের বা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের যে বৈভব আমরা প্রত্যক্ষ করি তার তুলনা

হয় না। তাই সংগতকারণেই সে ঋতুরাজ। প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ রূপের যে প্রকাশ আমরা বসন্তে পাই তা সত্যি অতুলনীয়।

বাংলার প্রকৃতির ষড়ঋতুর শেষ ঋতু বসন্ত। ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস মিলেই বসন্ত কাল; তারপর শুরু হয় নতুন বছর গ্রীষ্মকাল দিয়ে। শীতের পরপরই আর গ্রীষ্মের আগে বসন্তের যে কালপ্রবাহ তা মানুষের মন ও শরীরের জন্য আরামদায়ক ও প্রেরণাদায়ক। বিশেষত শীতের জীর্ণতা রিক্ততা বা বৃক্ষের পাতাঝরার বেদনা দিয়ে শীতের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই ক্ষত আমাদের ভুলিয়ে দেয় বসন্ত। শীতের একটা অংশ বসন্ত গ্রহণ করে সত্য তবে তা তার মোহন আর শান্ত রূপ। গাছে নব কিশলয় প্রকৃতিকে সবুজ করে তোলে, দখিনা বাতাস প্রকৃতিকে চঞ্চল করে তোলে, নানা বর্ণের ফুল ফোটে, পাখিরা গেয়ে ওঠে গান, প্রকৃতিতে নতুনের ছোঁয়া লাগে নানাভাবে। যে-কেউ তা বুঝতে পারে বসন্তের এই রূপ, স্পর্শ করতে পারে এর সুরভিত শোভা, হৃদয়ে সাড়া পড়ে যায় সব শ্রেণির মানুষের। সংবেদনশীল মানুষ আপ্লুত হয়ে পড়ে বাংলার এই রূপ দেখে। সন্দেহ নেই এই রূপ আমাদের নিজস্ব, বাংলার মাঠ ঘাট নদী প্রান্তরে ফসলে ফুলে ফলে যে নতুন আবাহন শুরু হয় তা আর কোনো দেশে নেই। ইউরোপ বা আমেরিকায় বসন্ত বাংলার মতো নয়। শীতপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে তাদের কাছে সামার বা গ্রীষ্মকাল অনেক আকাঙ্ক্ষার। সেখানের বসন্ত আমাদের মতো নয়। তবে ইউরোপীয় সাহিত্যে কবিরা বসন্ত নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, বিশেষত ইউরোপীয় কবিরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন । শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস প্রমুখ কবিরা বসন্ত নিয়ে ব্যঞ্জনাময় কবিতা লিখেছেন।

যে সময় শীত বিদায় নিতে শুরু করে, উত্তরের ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ার পরিবর্তে দখিনা বাতাস বইতে শুরু করে সেসময় থেকে শুরু হয় বসন্তের আগমনি গান। চারদিকে সাড়া পড়ে যায় যেন। বাংলার প্রাণিকুল, প্রকৃতি, মানুষ যেন গভীরভাবে অপেক্ষায় থাকে কখন আসবে ফাগুনের রঙিন আসর। কবি লিখেছেন– 'আজি দখিনা দুয়ার খোলা, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো'। আমরা প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথের মতো দখিনা দুয়ার খুলে বসে থাকি বসন্তের জন্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে বাংলায় আমরা শীতকে সহজে গ্রহণ করি রুক্ষতার আমেজে। তাই শীত শেষ হওয়াকে স্বাগত জানাই, অবশ্য শীতের একটু আভা থেকেই যায় বসন্তের গায়ে। শীত আর গরমের মাঝামাঝি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বসন্ত আমাদের নতুন স্বাদ আর স্বস্তি এনে দেয়। প্রকৃতির মধ্যে নতুন সুরের গুঞ্জরণ শুরু হয়ে যায়। ভ্রমরা গুনগুন করে গান গায়, কোকিল ডাকে। এরা সবাই মিলে স্বাগত জানায় বসন্তকে। গাছপালা লতাপাতা যেন শীতের খোলস থেকে বের হয়ে আসে মহা আনন্দে। শাল পিয়াল তমাল দেবদারু মেহগনি আম-কাঁঠাল সবাই নতুন করে জেগে ওঠে। চোখ মেলে তাকায় যেন। জেগে ওঠে ফুলের রাজ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়। কত রকমের ফুল যে ফোটে বসন্তে তাদের সব নাম আমরা জানি না। ডালিয়ার কথা ধরা যাক, ডালিয়া ফোটে বসন্তে তবে শীতে তার শুরু। গোলাপের কথা আলাদা করে বলতে হবে। ইরানি এই ফুল এখন আমাদের স্বদেশি। বাংলাদেশে বহু বিচিত্র জাতের গোলাপ এখন লাগানো হয়। ব্যাবসায়িক কারণে, বিশেষত বিয়ে ও ভালোবাসা দিবসে গোলাপের চাহিদা বাড়ে। এখন বাণিজ্যিকভাবে গোলাপ চাষ করা হয়। গোলাপ যেন বসন্তকে নতুন মাত্রা দেয়। এর বাইরে শিমুল পলাশ, অশোক, কিংশুক, কৃষ্ণচূড়া, শেফালি, সূর্যমুখী, জুঁই, গাঁদা, রাধাচূড়া, নাগলিঙ্গম. কাঠগোলাপ, কনকচাঁপা, চাপা, নয়নতারা. বাগানবিলাস, মধুমঞ্জুরী, অলকানন্দা, কাঁঠালিচাঁপা-সহ আরো কত ফুল রয়েছে। বাংলাদেশের শহরে গ্রামে মানুষ এখন প্রচুর ফুল চাষ করে। আর বসন্ত হলো ফুলের ঋতু।

বসন্ত হলো প্রেম ও ভালোবাসার ঋতু। আমরা যেন প্রকৃতিকে নতুন করে পাই, নিজেদেরকেও নতুন করে উপলব্ধি করি। শুধু বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীতে বসন্তকে বরণ করা হয়। নানা ধরনের উৎসব হয় সর্বত্র। বাংলাদেশে এখন বসন্ত রীতিমতো বড় উৎসব। বিশেষত তরুণ-তরুণীরা মাতে বসন্ত উৎসবে। নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বসন্ত উৎসব পালন করে। বাংলার নিজস্ব বসন্ত পালনের রীতি এভাবে ছিল না আগে। হলুদ হয়ে যাওয়া বিস্তীর্ণ সরিষার খেত দেখে কৃষক হয়তো মুগ্ধ হতো, কিংবা প্রকৃতির রঙিন বিভায় কিশোর-কিশোরী মেতে উঠত বিমল আনন্দে তবে এখনকার মতো সাড়ম্বরে ঘটা করে পালিত হতো না বসন্ত উৎসব। সে হিসেবে নববর্ষ বা হালখাতা পালনের চেয়ে বসন্ত অপেক্ষাকৃত নতুন উৎসব।

বসন্ত বাংলার অন্যতম প্রধান ঋতু হিসেবেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় এ সময় সংবেদনশীল মানুষের প্রাণের সব অর্গল যেন খুলে যায়। প্রাণে চঞ্চলতা আসে, প্রকৃতির রূপের সঙ্গে মনের যোগ স্থাপিত হয়। ঠিক সে কারণে বাংলা সাহিত্যে বসন্তকে লেখকেরা নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের প্রধান অপ্রধান সব কবিরা এমনকি প্রাচীন কাল থেকে নানা কবিরা বসন্ত নিয়ে পদ রচনা করেছেন। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের কবিরা বসন্ত নিয়ে তাদের মুগ্ধতার কথা বলেছেন। চর্যা কবি শবরী বালিকার কথা বলেছেন, যে গুঞ্জফুলের মালা পরে থাকে, প্রকৃতির মতো রঙিন তাদের শরীরের আচ্ছাদন। তাদের সেইসব বর্ণনা বাঙালির সাংস্কৃতিক মানস গঠনে সাহায্য করেছে। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বসন্ত নিয়ে পদ রচনা করেছেন। মধ্যযুগের কবি আলাওল লিখেছেন– 'প্রথমে বসন্ত ঋতু নবীন পল্লব/ দুই পক্ষ আগে মধ্যে সুমাধব/ মলয়া সমীর হৈল কামের পদাতি/ মুকুলিত কৈল তবে বৃক্ষ বনস্পতি।' প্রকৃতিতে বসন্ত প্রেমজ প্রেরণার সঞ্চার করে। লোকজধারার কবি ও গায়কেরা বসন্তের ফুলেল শোভাকে সংযুক্ত করেছেন তাঁদের রচনায়। বাংলাদেশের অনেক লোককবি বসন্তকে প্রেম ও উচ্ছ্বাসের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বাউল কবি আবদুল করিম বসন্তের সঙ্গে প্রেমের সংযোগ স্থাপন করেছেন তাঁর গানে। 'বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে, বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে, সই গো বসন্ত বাতাসে'। এই গানে কবি গ্রামীণ নারীর মনে বসন্তের প্রভাব এবং এর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ককে প্রকাশ করেছেন। জনপ্রিয় এই গান বাঙালি মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আধুনিক কবিরাও মুখর হয়েছেন বসন্তের বন্দনায়। শুধু তা-ই নয়, প্রাণের গভীর আবেগ বা সংবেদকে প্রকাশ করার জন্য বসন্তকে ব্যবহার করেছেন নানা অনুষঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান ও কবিতায় বসন্তকে বহুমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। বর্ষা তাঁর প্রিয় ঋতু হলেও বসন্ত নিয়েও প্রগল্‌ভ ছিলেন। তিনি বসন্ত পর্যায়ের ৯৮টি গান লিখেছেন। ১৩০৩ সালে তিনি ঋতুরঙ্গ উৎসবের আয়োজন করেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন– 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে/ তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে/ কোরো না বিড়ম্বিত তারে'।

এই কবিতায় কবি বসন্তের সঙ্গে মানবমনের গভীর সম্পর্কের সূত্রকে শনাক্ত করেছেন; একই সঙ্গে বসন্তের আনন্দময় প্রকৃতিকে মুখরিত করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। বসন্তের শিল্পসুষমাকে কবি নতুনভাবে চিহ্নিত করেছেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার গানে ও কবিতায় বসন্তকে নিয়ে আবেগমথিত কথা বলেছেন। বাংলার বসন্তের রূপ ও বৈচিত্র্য তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে গভীরভাবে। তিনি লিখেছেন– এলো বনান্তে পাগল বসন্ত/ বনে বনে মনে মনে রং সে ছড়ায় রে/ চঞ্চল তরুণ দূরন্ত।/ বাঁশীতে বাজায় সে বিধুর পরজ বসন্তের সুর/ পাণ্ডু-কপোলে জাগে রং নব অনুরাগে/ রাঙা হল ধূসর দিগন্তে'। বসন্তের দুরন্তপনা পাগলামিকে, বসন্তের চঞ্চলতা নতুন সুরের তালে বাঁধতে চেয়েছেন কবি। কবির ধারণা বসন্ত শুধু বনে রং ছড়ায় না, মনেও ছড়ায়। বাঁশির সুরেও বসন্তের রূপ ধরা পড়ে। কবি নজরুল একটি গানে লিখেছেন, 'ফুল ফাগুনের এলো মরশুম, মনে মনে লাগলো দোল/ কুসুম-শৌখিন দখিন হাওয়ার চিত্ত-গীত উতরোল।' এই গানে কবি মূলত বসন্তের আগমনি বার্তা আমাদের শুনিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর একটি কবিতায় বসন্তকে আধুনিক মানুষের গভীর সংকটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, নিছক বসন্তের বর্ণনা তিনি দেননি বরং এর তাৎপর্যগত উপলব্ধির কথা বলেছেন ব্যঞ্জনাসহকারে। তিনি লিখেছেন– বসন্তের রাতে যেমন দেখি/ সবিতা, মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি/ মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে/ ভূমধ্যসাগর ঘিরে সেই সব জাতি/ তাহাদের সাথে/ সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন।

বাংলা কবিতায় নানা পর্বে বসন্ত বিভিন্ন মাত্রায় বিকশিত; তার কারণ কবিরা বসন্তের রূপে মুগ্ধ শুধু নন, তাদের সুকুমার চিন্ময় হৃদয়ে বসন্ত যেন অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ফিরে আসে বারবার। বাংলার পথ ঘাট নদী নিসর্গ পাহাড় মিলে বসন্ত নব আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। বসন্ত শুধু সমতলের মানুষের মনেই রঙের ধারা বইয়ে দেয় না, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীও রঙিন হয়ে ওঠে বসন্তের উন্মাদনায়। তারা বিচিত্র বর্ণের জমকালো পোশাক পরে নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তকে বরণ করে। যদিও বৈশাখ তাদের প্রধান বরণীয় উৎসব।

বাংলায় বসন্তকে চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতি নিজেই আমাদের সামনে তার বিচিত্র সৌন্দর্যের ডালি খুলে দেয়। সব অব্যক্ত কথা যেন রঙিন ফুলের পাপড়িতে ব্যক্ত করে তোলে। সব মানুষকে আনন্দের ঝরনাধারায় মিলিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানায় বসন্ত। আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা যদিও এর তাৎপর্য ও সৌন্দর্যকে তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। কবিতা ও গান এক্ষেত্রে প্রধান আধার তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বসন্ত আমাদের প্রাণের উৎসব। আমাদের চিত্ত বিকশিত হয় বসন্তের অপূর্ব বিভা ও বৈভবে। আমরাই আমাদের সৃজনশীল চোখে, সংবেদনশীল অনুভবে বসন্তকে আবিষ্কার করেছি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত। এই কবিতার তাৎপর্য বোধহয় এইরকম যে বসন্ত আসলে আমরা নির্মাণ করি। আর বসন্ত হলো সেই আলো যা আমাদের প্রাণিত করে, আলোড়িত করে, এর মাধ্যমে আমাদের প্রাণের সব আনন্দের উৎসধারা যেন প্রবাহিত হয় অবিরাম বেগে। বাংলায় বসন্ত প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সংযুক্তি ও আনন্দের। প্রকৃতির শোভা আর মানবের মনের আনন্দ এখানে নতুন আনন্দময় স্রোতধারা নির্মাণ করে।

লেখক : অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

বেতার বাংলা গ্রাহক সেবা

সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য

সেবার ফি

* প্রতি কপি বই এর মূল্য ৩০ টাকা(ডাক মাসুল সহ)
* বাৎসরিক বান্ডল ১৮০ টাকা

সেবা প্রদানের সময়সীমা

৭ কার্যদিবস

সেবাটি পেতে প্রবেশ করুন এই লিংকে
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1712031489

আবেদন ফরম পূরণের নিয়মাবলি

১. আবেদন ফরমের লাল তারকা (*) চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করুন। অন্যান্য ঘর পূরণ করা ঐচ্ছিক।
২. আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হলে সংরক্ষণ করা যাবে এবং পরবর্তীতে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে ড্রাফট আবেদন পুনরায় শুরু করা যাবে।
৩. আবেদন দাখিলের পর প্রতিটি আবেদনের জন্য একটা স্বতন্ত্র ট্রাকিং নম্বর প্রদান করা হবে যেটি ব্যবহার করে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে আবেদনের অগ্রগতি জানা যাবে।

সূবর্ণ পথের টিকিট

শাহিন রিজভি

কোথাও অপেক্ষমান নদী
রয়েছে দাঁড়িয়ে
দুহাতে তার ভবিষ্যতের সূবর্ণ পথের টিকিট।

কবরের বাসিন্দারাও পেয়েছে কার্ড
রঙিন আমন্ত্রণের,
ওদের দুঃখ - কষ্টগুলো ছটফট করে
চিত হয়ে পড়ে আছে ঘাসের তলায়
এই বুঝি লাঙলের খোঁচায় দাঁড়ালো উঠে।
এতগুলো আদিম লাঙল
অথচ সীমিত পৃথিবীর জমি দাঁড়াবো কোথায়?
মৃতেরা গম্ভীর হয়ে আরো গহীনের পদাতিক হলো
উড়ছে মলিন ধুলো, ধুলো ধোয়া হলো
অন্ধকার শাড়ি আঁচল দুলিয়ে আড়াল করলো সব
তবু আমার ভয় কাটে না
প্রজাপতি দেখলেও ভয় হয়
সোনালি ধানের ক্ষেত, আমলকি বন,
বট, কুটিশ্বরী শাদা ফুল
সুবাসিত কামিনী, মাতাল মহুয়া
ভয় তবু কাটেনা আমার
বুঝি উঠে এলো পঙ্গপালের মতো সাদা কাফন।

নদীটি কোথায়, জানিনা কিভাবে যাবো
কত দূরে ঘাট

দাঁড়ালো একটি দুরন্ত বালক দ্বিধাহীন চোখে
'সময় তো বেশি নেই তৈরি হয়ে নিন'
গীর্জা, মসজিদ, গুম্ফা, প্যাগডা, মন্দির, ফায়া
শুধু আমি একা নাস্তিক।
যাত্রা পথে বাতাসেরা গালাগালি করে
চুল ধরে পিছে টেনে নিতে সামনে দাঁড়ায়
কেবল শার্টের বোতামগুলো খুলে যেতে থাকে
বালক সচল, বুকে তার নদীর স্বভাব।

একদিন পৌঁছে গেলাম নদীর কাছাকাছি
কলম্বাসের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে নিশান বিহীন
একটু এগিয়ে গেলেই সিঁড়ি
ততক্ষণে দ্বিধাহীন বালক মাস্তুলে উঠে গেছে
আতঙ্কবিহীন কণ্ঠে হাত নেড়ে নেড়ে
আঁধারের কুয়াশায় মুছে যেতে থাকে
'আমি চললাম ভবিষ্যৎ ইতিহাসে'
ভীত হাতে গেঁথে নিয়ে শার্টের বোতাম
ফিরে আসি সফেদ নরম বিছানাতে
তখনও জানালার গ্রিলে উঁকি দিয়েছিল চাঁদ
বাতাসে লবণ গন্ধ ডেকে ওঠে ফের

কোথাও অপেক্ষমান নদী যেন রয়েছে দাঁড়িয়ে
দুহাতে তার ভবিষ্যতের সূবর্ণ পথের টিকিট।

না গৃহ না সন্ন্যাস

রফিকুর রশীদ

নয়নতারা ঘুমিয়ে কাদা।

ঘরের ভেতরে আধো আলো-আঁধারি। বাইরে ফিনিক ফোঁটা ধবল জোছনা। সেই জোছনার একটা সরু ফালি কঞ্চির বেড়ার ফাঁক গলিয়ে এসে পড়েছে নয়নতারার মুখের ওপর। মাত্র ওইটুকু আলো এসে তার মুখে অপার্থিব সৌন্দর্যের সব ক'টা ঘুমন্ত বাতি যেন-বা একযোগে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঝোড়ো বাতাস নেই, ফলে আলোকপ্রভা একেবারে নিষ্কম্প স্থির। মন্টু ফকির নয়নতারার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে আনে দৃষ্টি, তারপর সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় নিরাবৃত শরীরের বাঁকে বাঁকে। দূরে নদীপারের গ্রামের ছবি যেমন অস্পষ্ট মনে হয় এই আলো-আঁধারিতে নয়নতারার দেহনদীকে ঠিক সেইরকম কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হয় না। নিকষ কালো অন্ধকারেই সে চিনেছে এই বাঁকানদী, তার জোয়ার-ভাটা, চিনেছে সে নদীতে ভাসমান কুমির এবং ত্রিবেণী ঘাট। অমাবস্যা চন্দ্রসাধন প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্বের ভেতর দিয়েই মন্টু ফকির এতদূর এসেছে, তার আবার ভয় কীসের, কীসের-বা উদ্বেগ? তবু তার ঘুম আসে না চোখে, এক পলকা ভাবনা হয় এই নয়নতারাকে নিয়ে– আগামীকাল তারা নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সাঁইজির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে তো!

আগামীকাল, এই আকালি সাঁইজির ধামে যাবারই তো প্রস্তুতি চলছে সেই কবে থেকে। মেহেরপুর থেকে সোজা পশ্চিমে মাইল তিন-চারেক গেলে শুভরাজপুর, তারপর সীমান্ত ঘেঁষে সাধুর আশ্রম। একসময় ছিল নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ, এখন আর সেই নির্জনতা নেই। দূরদূরান্তের শিষ্য-সামন্তের নিত্য আনাগোনা লেগেই আছে, এমনকি কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁকফোঁকর গলিয়ে ওপার থেকেও অনেক সাধু-সাগরেদ চলে আসে। একদা এই আকালি সাঁইজির হাতে মন্টু ফকিরের বাপ মন্তাজ ফকিরেরও চাল-পানি হয়। চাল-পানি হওয়া মানে দীক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক স্তর। প্রতিদিন পাঁচটি করে চাল খেতে হয় পানির সঙ্গে, সকাল-সন্ধ্যা। প্রথমে পঞ্চআত্মার শান্তি কামনা করে পাকপাঞ্জাতনের প্রতীক হিসেবে পাঁচটি চাল শিষ্যের হাতে তুলে দেন গুরু। এটাকে গুরুর প্রথম স্বীকৃতির স্বাক্ষর বলে গ্রহণ করে শিষ্য। মন্তাজ ফকির সেই স্বীকৃতি লাভের পর যেন-বা আকাশের চাঁদ হাতে পায়। অন্ধকার রাতে মেঠো পথে বাড়ি ফেরে, বুকের মধ্যে ভয়-তড়াশের লেশমাত্র খুঁজে পায় না। বরং আকাশভরা তারার মাঝে ডিগবাজি খেতে ইচ্ছে করে। একতারার তারে টুংটাং ধ্বনি তুলে গান ধরে– 'ভবে মানুষ

গুরু নিষ্ঠা যার...।' কিন্তু মন্তাজ ফকিরের এই দীক্ষা গ্রহণকে গ্রামের মোল্লারা মোটেই ভালোভাবে মেনে নেয়নি। বিচার-সালিশ বসিয়ে চুল-দাড়ি কেটে দেয় জবরদস্তি করে, তওবা করার জন্যে চাপ দেয়, নতুবা একঘরে করার হুমকি দেয়।

এসব সেই কবেকার কথা! আজকের এই মন্টু ফকির তখন তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোর বই তো নয়! এতদিন পর রাতের দুই প্রহর গড়িয়ে যাবার পর বাবার মুখ কেন মনে পড়ছে! সকালের আলো ফুটলেই সূচনা হবে শুভদিনের। সাঁইজি নিজে থেকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন– বিষ্যুদবার তারা দুজনে আশ্রমে গিয়ে পৌঁছুলে তবে হবে বাল্যসেবা। মানে সকালের নাশতা, চিড়ে-দই-কলার ফলার। দুপুরবেলা পূর্ণসেবার আগেই হবে তাদের খিলকা প্রদান। এ সবই পূর্বনির্ধারিত। নয়নতারার সঙ্গে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। দুজনের গুরুদীক্ষা হয়েছে অনেক আগেই, এবার আসছে ভেক বা খিলকা ধারণের অধ্যায়। চূড়ান্ত পর্ব। ধবধবে কাফন– সাদা কাপড়ে মোড়া অন্য এক জীবন। এ জীবনে প্রবেশের দুয়ার হচ্ছে গুরু। এই দুয়ারে কড়া নাড়ার অধিকার দিনে দিনে নানান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। তারপর গুরু সদয় হলেই মুক্তি।

এই আকালি সাঁইজিও তো তাদের বাজিয়ে দেখতে কম করেননি! এত চেনাজানা, এত যে মন্তাজ ফকিরের জন্যে বুকের মধ্যে হাহাকার, সেই মন্তাজের ছেলে মন্টু যেদিন নয়নতারাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শরণ নেয়, হাতজোড় করে আশ্রয় প্রার্থনা করে, সেদিন কি তিনি সহজে ছেড়ে দিয়েছেন! কতরকম তাঁর প্রশ্নবাণ, একটার পর একটা ছুড়ে মারেন! বিশেষত নয়নতারার দিকে তাকিয়ে জানতে চান, এ পাখি তুই কোথায় পেয়েছিস বাপ! পোষ মানিয়েছিস?

শুধু হাতজোড় নয়, মন্টু তখন চোখ ইশারায় নয়নতারাকে ইঙ্গিত দেয় এবং নিজেও আভূমি নত হয়ে সাঁইজির দুই পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ চায়। তারপর নয়নতারার পরিচয় দিতে গিয়ে জানায় বর্ডারের ওপারে তেহট্ট থানার নন্দীগ্রামের রতন স্যাঁকরার মেয়ে হলেও সে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তার হাত ধরে পথে নেমেছে। মন্টু আরো নিশ্চিত করে, শান্তিপুরের খুব কাছেই এক শ্রীপাট আশ্রমে গিয়ে তারা উভয়েই গুরুদীক্ষা নিয়েছে। আকালি সাঁইজি চোখ বড় বড় করে দুজনেরই মুখে মুখে তাকান, তারপর মন্টুর কাঁধে হাত রেখে শুধান– তা আমার কাছে কেন এসেছিস?

মন্টু বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়, আমার বাবাও তো এসেছিল আপনার কাছেই।

– হ্যাঁ, মুন্তাজকে আমি দীক্ষা দিয়েছি। সে কাপুরুষ। নিজেকে চিনতে পারেনি।

– আপনাকে চেনা সহজ নয়, সে আমি জানি। কিন্তু কাপুরুষ বলছেন কেন?

ঘন গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে একটুখানি হেসে ওঠেন সাঁইজি– নিজেকে নিয়ে এরকম ইয়ার্কি মারার কোনো মানে হয়! নিজের মাঠ নিজের ফসল ফেলে এভাবে কেউ পালিয়ে যায়!

মন্টু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে– আপনি কি আত্মহত্যার কথা বলছেন?

– তবে আর কী বলছি! নিজেকে চেনাই হলো না যার, সে কেন হত্যা করবে নিজেকে? কোন অধিকারে?

মন্টু হঠাৎ যেন বোমা ফাটায়– আমার বাবা আত্মহত্যা করেনি। তাকে হত্যা করেছে গাঁয়ের লোক।

– বলিস কী বাপ!

– আমরা নতুন করে আবার দীক্ষা নেব আপনার কাছে।

– কেন রে বাপ! এ লাইনে আসবি কেন?

দুজনেই মাথা নিচু করে থাকে। কথা বলে না। আকালি সাঁইজি প্রশ্ন করেন– বাপের হত্যার বদলা নিবি নাকি?

মন্টু সারা শরীর শিউরে ওঠে। আকালি সাঁইজির চোখে চোখ রেখে বলে– বদলা আমি নিতে চাই, তবে কাউকে হত্যা করে নয়। খুনখারাবির বদলা নয়।

– তাহলে?

– আমার বাবা যে কাজ শেষ করতে পারেনি আমরা সেটা করতে চাই সাঁইজি। সেটাই হবে বদলা নেয়া। আপনি ফেরাবেন না।

সাঁইজি খুশি হন। দুজনের মাথায় দুই হাত রেখে বলেন– বলিস কী বেটা! পারবি তোরা এ পথে দাঁড়াতে? এ বড় পিছল পথ।

নয়নতারা এতক্ষণে মুখ খোলে– আমরা তো জেনেশুনেই এসেছি, বাবা। এখান থেকে আমরা ফিরে যাব না।

আকালি সাঁইজি যেন চমকে ওঠে– দাঁড়া দাঁড়া, নন্দীগ্রামের কার মেয়ে তুই?

– আপনি চেনেন নন্দীগ্রাম?

– ওরে বাবা, আমি তো পাইকপাড়ার ছেলে। পাশাপাশি গ্রাম। শৈশবজোড়া কত স্মৃতি আছে, কত বন্ধুবান্ধব...

এবার মন্টু যোগ করে– নন্দীগ্রামের রতন স্যাঁকরার ছোট মেয়ে নয়নতারা।

– স্যাঁকরাকে দিয়ে কি গুরুগিরি হয়! একবেলা সে যায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কাছে তো আরেক বেলা সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের কাছে। দুই নৌকায় পা দিলে তার এই দশাই তো হয়। নয়নতারাকে জিগ্যেস করেন,

– তা কয় ভাইবোন তোমরা? শেকড়-বাকড় কদ্দুর নামিয়েছে তোমার বাবা?

মাথা নিচু করে নয়নতারা জানায়– পাঁচ বোন, এক ভাই।

– ওরেব্বাবা! এ যে লতায় লতায় লতিয়ে একাকার!

– শেকড়-বাকড় হলো শিষ্যভক্ত। লতা-পাতা শেকড়-বাকড়– এসব কী যে...

বাক্য শেষ হয় না নয়নতারার। হা হা করে হেসে ওঠেন আকালি সাঁইজি, হাসি থামলে আবার তত্ত্বকথা বলেন,

– 'আগি শান্তিপুরে চলো রে মন তবে গুপ্তিপাড়ায় যাবি।'

এ হচ্ছে তত্ত্বগানের বাণী। এ গানের মর্ম হচ্ছে– দেহমনকে শান্ত করলে তবে গুপ্তিপাড়া অর্থাৎ গুপ্তকথা জানা যাবে। লতার কথা শেকড়ের কথা জানা যাবে। কিন্তু রতন স্যাঁকরা তো বাঁধা পড়ে রইল বোধিতনে। এয়োতনের থেকে কোথায় নিত্যনের সাধনা করবে, তা নয় বোধিতনের ফাঁদে আটকে গেল।

এয়োতন-নিত্যন-বোধিতন এসব গূঢ়ার্থ শব্দের অর্থ অনেক পরে জেনেছে মন্টু এবং নয়নতারা। এই মেহেরপুরের মালোপাড়ার বলরাম হাড়ি লৌকিক যে ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন, তার মর্মমূলে বৈরাগ্য নয়, আছে গৃহীর সাধনা। এ সাধনার গোড়াতে আছে এয়োতন। বলা হাড়ির 'মনের মানুষ' যারা, তারা জন্মদ্বারে যাবে শুধু সৃষ্টির জন্যে। অকারণ বীর্যক্ষয়কে তারা নরহত্যার তুল্য পাপ বলে মনে করে। নারীর ঋতুস্রাবের সাড়ে তিন দিন পরে অর্থাৎ চতুর্থদিনে সুসন্তান কামনা করে স্ত্রী সহবাসে যাওয়া এয়োতনের বৈশিষ্ট্য। সংসারে অনাসক্তি আর জন্মদ্বারে বিতৃষ্ণা তৈরির মাধ্যমে এয়োতনের পরের স্তর নিত্যনের সাধনা করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে হয় উলটো। প্রতিদিন অকারণ অধিকাংশ মানুষ বোধিতনের ফাঁদে আটকা পড়ে। আত্মসর্বস্ব ভোগী এই মানুষকে দিয়ে বড় সাধনা হবে কী করে!

এসব তত্ত্বকথার সাধারণ ব্যাখ্যা এবং দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনেক পরে জেনেছে মন্টু শাহ্ এবং নয়নতারা। সেই ব্যাখ্যা ভক্তিভরে তারা গ্রহণও করেছে পরে। কিন্তু সেই প্রথম দিনেই আকালি সাঁইজি দীক্ষা দানের শর্ত হিসেবে কঠিন এক পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। গুরুগৃহে তাদের এক মাস কাটাতে হবে। শোবার সময় কিছুতেই মুখোমুখি নয়, পিঠের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে থাকতে হবে। মুখ ফেরালেই পতন, দুধ নষ্ট এক ফোঁটা গো-চোনায়।

কঠিন সে পরীক্ষায় মন্টু এবং নয়নতারা উতরে যাবার পর নতুন করে তাদের চাল-পানি হয়েছে, দীক্ষা পেয়েছে। আকালি সাঁইজির কাছে বিস্তারিত জেনেছে– শরীরকে তারা উপেক্ষা করে না, শাসন করে, পোষ মানায় এবং শরীরের কাছে যা পাবার তা বুঝে নেয়। অযথা শুক্রক্ষয় আর সন্তান জন্ম মানে বাউলধর্মে আপ্তমরণ, অন্য কথায় নিজেকে মারা। তবে হ্যাঁ, এ লাইনে পতনও আছে। যারা বারংবার ঘুরেফিরে জন্মদ্বারে যায়। সেই একমাসের স্মৃতি মনে হলে মন্টুর অন্তর তড়পায় এক প্রশ্ন– হাতের মুঠোয় অগ্নিপিণ্ড ধরে রাখা কি তার চেয়ে কঠিন? তরঙ্গসংকুল বাঁকানদী যতই হাতছানি দিক, কুমিরের লেজ সাপটানোর মধ্যে হাত-পা ছুড়ে সাঁতরানো কি সোজা কথা! হায় বাঁকানদী, মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে কোথায়! জল শুকালে আবার সেই মীন নাকি হাওয়ায় ভাসে, এ কী ভীষণ গোলকধাঁধা!

এই গোলকধাঁধার গেরো খুলতে হলে গুরুপদে নিজেকে নিবেদন করা চাই। একদিন সাঁইজি কাচের দুটো টুকরো এনে সামনে ধরেন। প্রথমে স্বচ্ছ কাচের পাত সামনে ধরে জিজ্ঞেস করেন– কী দেখছিস?

মন্টু এবং নয়নতারা দুজনেই বলে ওঠে– আপনাকে দেখছি। কাচের ওপারে তো আপনিই আছেন।

সাঁইজি এবার এক পৃষ্ঠায় পারা লাগানো আয়নার টুকরো সামনে ধরে বলে– কী দেখছিস এবার?

– খুব সোজা উত্তর– নিজেকে দেখছি।

এক গাল হেসে তিনি জানতে চান– কেন, আমাকে দেখা যাচ্ছে না?

– নাহ্!

– আমি কি তাহলে নেই?

জিভ কাটে মন্টু, হাত কচলে বলে– আপনি আছেন কাচের গায়ে লাগানো পারার ওপারে।

– আহা, আছি তাহলে! আমি আছি পারার সাথে মিশে। পারা না থাকলে সব ফাঁকা ফকফকা। পারা আছে বলে, মানে তোদের গুরু আছে বলেই তোরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছিস, ঠিক তো? এই যে গুরুর মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখা, এটাই কিন্তু সারকথা।

গুরুভক্তির নানাবিধ কণ্টাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে শিষ্যকে পৌঁছুতে হয় চূড়ান্ত গন্তব্যে। সেই পর্বতচূড়ায় আরোহণ যেমন কঠিন, অবতরণও তেমনই কঠিন; পতনের কথা আলাদা। পতন আর অবতরণ কিছুতেই এক নয়। পতনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবার পর গুরু খিলকা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যে-কোনো শিষ্যের জন্যে সেই ঘোষণা হচ্ছে পরম পুরস্কার। এক জীবনের অন্ধকারে প্রবেশ করে আরেক জীবনের পরিশুদ্ধ আলো। এই আলোকপ্রাপ্তির জন্যেই তো শিষ্যের যত সাধন-ভজন! মন্টু শাহ এবং নয়নতারার জীবনে বহু প্রতীক্ষিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যতই এগিয়ে আসে, দুজনে ততই রোমাঞ্চিত হয়, পুলকিত হয়। আগের রাতে সন্ধ্যাবাতি জ্বালানো হয়ে গেলে হাতে একতারা নিয়ে মন্টু শাহ গান ধরে : 'বাড়ির কাছে আরশিনগর...।' মুখে আহ্বান জানানোই লাগে না, নয়নতারা দুই হাতে প্রেমজুড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। কান খাড়া করে একতারার

তাল ধরতে চেষ্টা করে, তারপর সোমের ফাঁক ধরে টুংটাং করে ঠিকই ঢুকে পড়ে গানের মধ্যে। দুহাতের আঙুলের বাঁধা খঞ্জনিকে স্থানীয়ভাবে প্রেমজুড়ি বলে। কী যে মিষ্টি ধ্বনি তার, সঠিক মাত্রায় গানের সঙ্গে মিশে গেলে কানে তখন সুধা বর্ষিত হয়।

মন্টু শাহর ভরাট কণ্ঠে আরশীনগরের পড়শির বিবরণ সুরের মূর্ছনায় ভেসে বেড়ায়– 'কী বলব সে পড়শির কথা, ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে...।' ভাবনার কথা বটে, আরশীনগরের এই পড়শি তাহলে কোথায় থাকে, কীভাবে থাকে! সেই জবাবও আছে লালনের গানে– 'ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর ক্ষণেক ভাসে নীরে।' সাইকেলে হঠাৎ ব্রেক কষার মতো মন্টু শাহ দুম করে বন্ধ করে দেয় গান। সহসা নয়নতারার দুহাত জড়িয়ে ধরে প্রেমজুড়ির বাজনা থামিয়ে দেয়। কী যে পাগলামিতে পেয়ে বসে, দুহাতে নয়নতারার মুখমণ্ডল তুলে ধরে সে প্রশ্ন করে,

– তুমি আরশীনগর চেনো?

নয়নতারার শরীর থেকে কী এক সৌরভ ভেসে আসে। সন্ধ্যাবেলায় কোনো সস্তা পাউডার মেখেছে কি না কে জানে! তার শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন হয়ে আসে। কোনোমতে সে উচ্চারণ করে,

– তুমি চেনালেই চিনি।

– তুমি তো নয়নতারা, তুমিই ভালো বুঝবে। দুই চোখের ভুরুর মাঝখানে যে সূক্ষ্ম জায়গা, সেটাই হচ্ছে আরশিনগর। সেইখানে বাস করে অচেনা পড়শি।

– তার মানে অচিন মানুষ!

– কেন মনের মানুষ বলা যায় না তাকে?

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয় না নয়নতারা। দুহাতে মন্টু শাহর গলা জড়িয়ে ধরে সে গেয়ে ওঠে– 'পড়শি যদি আমায় ছুঁতো, যম যাতনা সকল যেত, দূরে।' এই পর্যন্ত গাইবার পর তার কণ্ঠে মৃদু ফোঁপানি শোনা যায়। সে আর লালন একখানে থাকার পরও যে লক্ষ যোজন ফাঁক থেকে যায়, সেই হাহাকারই যেন মর্মরিত হয়ে ওঠে।

মন্টু শাহ তখন জড়িয়ে ধরে নয়নতারাকে, বুঝিয়ে বলে– আরশিনগর পৌঁছুতে হলে ভজতে হবে সোনার মানুষ। সে-ই পড়শি। 'নড়েচড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না।'

নয়নতারার কণ্ঠে তখন সাগরতরঙ্গের আছড়ে পড়া জলোচ্ছ্বাস। স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সে দাবি করে– তুমিই আমার সোনার মানুষ। আমার আরশীনগর তুমি। তুমিই আমার দয়ালচাঁদ। অরূপে স্বরূপে তুমি। আমার আরশিও তুমি, পড়শিও তুমি।

মন্টু শাহ টের পায় তার দেহভাণ্ডে তিন শ ষাট রসের নদীর কূল উপচিয়ে ঢেউ উঠছে। প্রবল এই ঢেউয়ের মুখে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে! অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, মনে পড়ে যায় আকালি সাঁইজির মুখের ছবি, আগামীকাল থেকে তিনি দেবেন শুভ্র কাফনে মোড়া পরিশুদ্ধ অন্য এক জীবন। যাপিত সে জীবনে কেবল মৃত্যুর আরাধনা মাত্র। নয়নতারাকে সকৌতুকে মনে করিয়ে দেয়, সকালের আলো ফুটলেই আজকের এই রাত হারিয়ে যাবে।

নয়নতারা শুধু অস্ফুটে বলে, সকাল হতে এখনো অনেক বাকি।

মন্টু শাহ উপলব্ধি করে, নয়নতারা আজকের এই রাতের প্রহরগুলো রাঙিয়ে তুলতে চায় মনের মাধুরী দিয়ে, দেহনদী তার কাণায় কাণায় পূর্ণ; সে নদীতে নেমে টের পায়– এ হচ্ছে কূল উপচানো দশা। ওপারে মেঘের ঘটা, কনক ও বিজলিছটা, মাঝে নদী বহে সাঁই সাঁইরে...; বিষম নদীর পানি ঢেউ করে হানাহানি...। মন্টু শাহ সেই ঢেউয়ের দাপাদাপির মধ্যেই আরশিনগর পৌঁছে যায়। কিন্তু পড়শি কোথায়? কী খবর পড়শির?

রাতের প্রহর গড়িয়ে চলে, ঘুম আসে না মন্টু শাহর চোখে। দুচোখের পাতায় যদিও আকাশভাঙা জোছনা এসে গড়িয়ে পড়ে ঘরের বেড়ার ফাঁক গলিয়ে, তখন সে কী করে! এপাশ-ওপাশ করে। একি শয্যাকণ্টকি! নাহ্, নয়নতারার ক্লান্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই যম যাতনা হারিয়ে যায়। কণ্টকি কীসের! না না, যম যাতনাই-বা কীসের!

ঘুম নয়, ভোররাতের দিকে হালকা একটু তন্দ্রালু ভাব এসেছিল চোখে, ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নে তাও কেটে যায়। চোখ রগড়ে ধাঁ করে উঠে বসে মন্টু। ভাবতে চেষ্টা করে, তার গুরু এভাবে কেন দেখা দিলেন! কী বুঝাতে চাইলেন! ভোর রাতের স্বপ্নের নিশ্চয় কোনো তাৎপর্য আছে। আলো-আঁধারির মধ্যে আবারও দৃষ্টি চলে যায় নয়নতারর দিকে। আহা, ঘুমিয়ে কাদা। কাদা হবে কেন? ওটা কথার কথা। কাদা নয়, ক্ষীর। সাঁইজি তো বুঝিয়েই বলেছেন– নারী আমাদের ত্যক্ত নয়। নারীকে নিয়েই তো সাধনা। বিন্দু-সাধনা। যাকে বলে রসের ভিয়ান। দুধ জ্বাল দিয়ে হয় ক্ষীর। জ্বাল দিলে তো দুধ উথলে উঠবেই, ক্ষীর হয়ে গেলে স্থির শান্ত; আর ওথলানো নেই। গুরু ওই কথাটাই বলেন উপমার আশ্রয়ে– কামকেও পাকে চড়িয়ে শান্ত করতে হয় বৎস!

ক্ষীরের মতো শান্ত।

ভোররাতের স্বপ্ন বলে কথা! আকালি সঁইজি নিজে হাতে তাকে সেলাইবিহীন শ্বেতশুভ্র খিলকা পরিয়ে দিচ্ছেন, সাদা কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে দিচ্ছেন, হাত বেঁধে দিচ্ছেন; নয়নতারাকে সাজিয়ে দিচ্ছে গুরুমা। তারা দুজনেই ভয়ে কাঁপছে। সাঁইজি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন– এখন থেকে তোমরা অন্ধ, হাত থাকতে নুলো, পা থাকতে খোঁড়া, জিভ থাকতেও স্বাদ গ্রহণে অক্ষম। আজ থেকে তোমরা জিন্দা-মরা, জাগতিক সকল লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে তোমাদের অবস্থান। ব্যাখ্যা চলতেই থাকে, গুরুমা হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে : 'ও মা, আমার এ কী হলো! ও নয়ন!'

গুরুমার হাতে সাদা ধবধবে খিলকা ধরাই আছে, খিলকার মধ্যে মানুষ নেই। এ কি জাদুমন্ত্র নাকি! জ্বলজ্যান্ত নয়নতারা গেল কোথায়! তন্দ্রাভাঙা চোখে স্বপ্নের অশ্রুকণা নিয়ে মন্টু শাহ আবারও তাকায় নয়নতারার দিকে। সে তখন পাশ ফিরে শোয়। তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় সোনার মানুষের বিছানার দিকে। কে বলবে, এই মেয়েটিই কিছুক্ষণ আগে স্বপ্নের ভেতর থেকে পালিয়ে এসেছে॥

লেখক : শিক্ষাবিদ, গবেষক ও কথাসাহিত্যিক

ফাল্গুনে মন প্রকৃতির রূপে

মনসুর আজিজ

বৃক্ষ মেলেছে নতুন পাতা ডালে ডালে গায় পাখি
রোদের কণাকে দুই হাতে তুলে সারা গায়ে তাই মাখি
ফাগুন আগুনে গাছ ভরে গেছে পলাশ শিমুলে লাল
ধানচারা মাঠে দখিনা বাতাসে নেচে ওঠে বেশামাল।

সোনালু ফুলের হলুদ গন্ধ আল পথে ভেসে আসে
কৃষ্ণচূড়ার মাতাল ঢেউয়ে বেজার মনও হাসে
মাছরাঙা জপে ধ্যানের তসবি বিলঝিল থাকে চুপ
নিথর খালের উছল পানিতে কিশোরীরা দেয় ডুব।

নিঝুম রাতের গহীন কূহরে রাতজাগা পাখি ডাকে
জোছনার সুতো ফাঁকতালে তাই বিচিত্র ছবি আঁকে
ভোরের সিথানে কণকলতার উজ্জ্বল আভা দেখে
কাঁঠালচাপার হলুদ আভাকে কিছুটা নিচ্ছি মেখে।

ফাল্গুনে মন প্রকৃতির রূপে অপরূপ হয়ে সাজে
নিশির শিশির মাড়িয়ে বনের গানের সুর যে বাজে।

বাংলা আমার ভাষা

সোহরাব পাশা

ভাষা মানে অনন্ত রাত্রির নিচে নিদ্রিত সুন্দর
অন্ধকারে হেঁটে আসা ভোরের রোদ্দুর
কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ, শিমুলে কোকিলের গান
অনিঃশেষ বসন্ত - বাগান

ভাষা মানে ভালোবাসার বিনয়ী সকাল
মেঘের জানালা খোলা প্রসন্ন দুপুর
রোদ ভেজা বৃষ্টির শব্দ,

ভাষা মানে মুগ্ধ স্মৃতির গুঞ্জন ভরা
দীর্ঘ এক স্বপ্নযাত্রা, অশেষ সুন্দর
প্রিয় চোখে স্নিগ্ধ জোৎস্নার হাসি;

ভাষার আলোর পাতা পড়ে
দীর্ঘ রাত্রিগুলো খোলে ভোর
ভাষা মানে পেছনে না ফেরা সময়
সভ্যতার দিকে হেঁটে যাওয়া।

বাংলা আমার প্রিয়ভাষা
জ্যোতির্ময় উচ্চারণে সব বন্ধ খুলে যায়
রংধনুর বর্ণিল আকাশ নিচু হয়ে
শহিদ মিনারের ছায়ায় দাঁড়ায় ।

মুক্তিযুদ্ধের ছোটগল্প: বিকল্প বয়ান

ড. মো. মেহেদী হাসান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় প্রধানত একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বণ্টনে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ থেকে। বাংলাদেশের এ আন্দোলনের অর্থনৈতিক চরিত্র থাকলেও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয়তাবাদী। এ জাতীয়তাবাদের ভেতরে সমাজতান্ত্রিক উপাদান ছিল প্রবল আবার আলাদাভাবে জাতীয়তাবাদী নয়, এমন সমাজতান্ত্রিক দলগুলোরও বড় অংশের সমর্থন ছিল এতে।

যে বিষয়ে আমরা আজ আলোচনা করতে যাচ্ছি সে বিষয়ে কথা বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৃত্তান্তটা আমাদের বুঝতে হবে। বলা বাহুল্য আর এ বৃত্তান্ত হলো বৈষম্যমুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। আমরা মুক্তিযুদ্ধের ছোটগল্পগুলো পড়তে গিয়ে এর অংশগ্রহণকারী চরিত্র, তাদের শ্রেণিপ্রতিনিধিত্ব, শ্রেণি-আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকার, সর্বোপরি লেখকদের দৃষ্টিকোণে এই বৃত্তান্তটি কীভাবে উঠে এসেছে তা দেখার চেষ্টা করব। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির মহাকাব্য তাই এ বিষয়ে ছোটগল্প সংখ্যায় যেমন বিপুল, বৈচিত্র্যেও তেমনি পূর্ণ। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান গল্পকারদের কয়েকটি গল্প আলোচিত হবে।

দুই.

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সেকালে রাজনীতি সচেতনতা এদের কতটা ছিল সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু শ্রেণিসচেতনতা তাদের রাজনীতি সচেতন করে তুলেছে, এটা বলা যায়। এ রাজনীতি সচেতনতার জাতীয়তাবাদী চরিত্রও লক্ষ করার মতো। ফলে এদের শ্রেণি-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে নানাভাবে। উদাহরণস্বরূপ রিজিয়া রহমানের (১৯৩৯-২০১৯) 'একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্য' গল্পটি আমরা বিবেচনায় নিতে পারি। গল্পের প্রধান চরিত্র মাজেদা অতি দরিদ্র বিধবা। সংসারে তার বিবাহযোগ্য মেয়ে, বয়স আঠারো। তাই সে স্বপ্ন দেখে ১৯৭০-এর নির্বাচনে ভোট দিলে তার সুদিন আসবে। 'ছেঁড়া শাড়িতে তালি দিতে দিতে সুদিনের স্বপ্নটা গেঁথে তুলছিল মাজেদা'।

মাজেদার আকাঙ্ক্ষা বড় কিছু নয়, একটা হ্যাংলা জাল যা দিয়ে তার

ছেলে মাছ ধরবে আর একটা নিরপরাধ আঠারো বছর বয়সের আইবুড়ো মেয়েটা যে কিনা বিয়ে হচ্ছে না বলে নিজেকে নিজেই দায়ী করছে। বেঁচে আছে চোরের মতো, অপরাধীর মতো। মায়ের আশা, তারও একটা বিয়ে হবে। আমরা ধরে নিতে পারি, গল্পের শিকদার সাহেবের আকাঙ্ক্ষা আর মাজেদার আকাঙ্ক্ষা এক না হলেও দুজনেরই লক্ষ্য এক, সেটা বিজয়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়। কেতনপুরের জলবিচ্ছিন্ন অজ পাড়াগাঁর মাজেদা দেখে, ইপিআরের জোয়ান পালিয়ে আসে মোটরসাইকেল নিয়ে। অসহায় দরিদ্র মাজেদার কাছে আশ্রয় চায়। মোটরসাইকেল রেখে সেও যুদ্ধের জন্য পালিয়ে যায়। মাজেদা মোটরসাইকেলটা সংরক্ষণ করে রাখার চেষ্টা করে সন্তানের মতো করে। বেশি দিন এ কাজ করতে পারে না। বড় ছেলে মালেক যুদ্ধে চলে যায়। গ্রামে রাজাকারদের তৎপরতা বেড়ে গেলে আর মুক্তিযোদ্ধা বড় ছেলে ফিরে এলে আরো জটিল হয়ে ওঠে সময়টা। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি মিলিটারির আক্রমণ হলে মাজেদা তাতে অংশ গ্রহণ করে। অংশগ্রহণ করে তার ছোট ছেলে মজিদ, মেয়ে মজিরন। পুরো পরিবার যুদ্ধে অংশীদার হয়ে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের রাখা গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা রাজাকার আর পাকিস্তানি মিলিটারিকে প্রতিহত করে। এরপর কী হয় আমরা জানি না। ছোটগল্পের কাছে সেটা দাবিও নয়। কিন্তু এ পরিবারটি সারা বাংলাদেশের একটা মিনিয়েচার বা রূপক হয়ে ওঠে যেন। এ গল্প নিম্নবর্গের এক বিধবা নারীর গল্প, যে নারী ১৯৭০-এর নির্বাচন থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে আর পরে পুরো পরিবারকে নিয়ে এক অসমযুদ্ধে বিজয়ী হয়। এ যুদ্ধ একদিকে মুক্তির অন্য দিকে একটি পরিবারের প্রতীকী অংশ গ্রহণেরও যে পরিবার শ্রেণিচরিত্রে নিম্নবর্গের।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র আমাদের প্রধান বৃত্তান্তে ক্ষীণভাবে উপস্থাপিত। মুক্তিযুদ্ধে নারী উপেক্ষিত। নারীকে যতটুকু দেখানো হয় তাতে তার দুর্বল আর নির্যাতিত রূপটাই প্রধান হয়ে ওঠে। রিজিয়া রহমানের গল্পটি এ দিক থেকে ব্যতিক্রম। মাজেদার সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও বীরত্ব যেমন আমাদের কাছে পৌঁছায়, তেমনি সত্যেন সেনের 'পরীবানুর গল্পে' পরীবানুর সাহসিকতার গল্পও আমরা পাই। 'পরীবানুর গল্পে' সত্যেন সেন প্রত্যক্ষ বিবরণে যান না, অন্যের শোনা গল্প পরিবেশন করতে গিয়ে অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দূরত্ব গল্পটাকে জমাট বাঁধতে দেয় না।

তিন.

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'আমাকে একটি ফুল দাও' গল্পটি আমাদের একটি ভিন্ন রকমের আখ্যান শোনায়। এ এক আকাঙ্ক্ষার গল্প। সে আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধফেরত এক যুবক ওমরের। মাজেদার মতোই এ আকাঙ্ক্ষাও কোনো উচ্চাভিলাষী কিছু নয়। যুদ্ধফেরত ওমর দেশে প্রবেশ করেছে বিজয়ীর বেশে। দেশে ঢোকার মুহূর্তটি আমরা স্মরণ করি– 'কিন্তু আশ্চর্য বর্ডারের সীমারেখা পেরিয়ে দেশের মাটিতে পা দিতেই মনপ্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল; সে বুক ভরে শ্বাস টানল। আহ, কী আরাম, শান্তি!' কিন্তু আমরা দেখব এ তীব্র অনুভূতি একটা বড় ধাক্কা খাবে, যখন দেশ অর্জনের পর তার ব্যক্তি জেগে উঠবে, কিন্তু ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তি বেদনাময় হয়ে দেখা দেবে।

যুদ্ধে গিয়ে মরে যাওয়াই ছিল ওর জন্যে স্বাভাবিক, মরে সে গিয়েওছিল দেশের কাছে। একটা মরণোত্তর খেতাবও জুটেছে তার। কিন্তু সে আসলে মরেনি। একসময় ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো ভিক্টোরিয়া কলেজের এক ছাত্রীকে। লেখক তার প্রেমময় অনুভূতিপ্রবণ মনটাকে বোঝার জন্য সে সময়ের কথা স্মরণ করেন। নজরুলের একটি গান 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে। সে কি তুমি সে কি তুমি?' গানের মতো করেই সে উপলব্ধি করত প্রেমিকা স্ত্রীকে, একটা কাব্যময় নামও দিয়েছিল– স্বপ্না। তারপর যুদ্ধ একটা ব্যবধান তৈরি করে দেয় দুজনের মধ্যে। একটা অলঙ্ঘ্য দেওয়াল যেন সেটি। ফিরে এসে ওমর দেখে স্ত্রীর বিয়ে হয়ে গেছে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। আলাউদ্দিন আল আজাদের ভাষায়, ওমর দেখছে : 'গর্ভবতী স্ত্রী পাশে, সন্তানকে ধরে আছে, পরম আদরে বাঁ হাতের ওপরে বসিয়ে, তরুণ ফয়সলকে দেখাচ্ছে সফলকাম স্বামী, গর্বিত পিতা'। লেখক সমাপ্তি টানছেন এভাবে– 'একটু এগিয়ে গিয়ে মেয়ের গালটা একবার সস্নেহে টিপে দিল, এবং নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ওদেরকে সালাম জানিয়ে, দ্রুত গেটটা পেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সন্ধ্যার ঘরফিরতি রাস্তায় গিয়ে পড়ল!' এ গল্পে আমরা যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া এক বীর, যার সামনে ছিল স্বপ্নের একটা দেশ, তার পরিবার; সে ব্যক্তিকে ভেঙেচুরে পড়তে দেখি। বেঁচে থাকা যুবক ওমরের জন্য আর কোনো গন্তব্য আমরা খুঁজে পাই না। লেখকও পান না। তাই তাকে ছুড়ে দেন জনবহুল রাস্তায়।

হাসান আজিজুল হকের 'ভূষণের একদিন' গল্পটির পটভূমি গ্রাম। অনেকটা 'একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্ম' গল্পের মতোই এ গ্রামও জললগ্ন খুলনার কোনো একটি গ্রাম। ভূষণ কোনো যুদ্ধে অংশ নেয় না। সে দিনমজুর, হতদরিদ্র। তার কণ্ঠস্বরও কোথাও পৌঁছায় না, এটা কেবল স্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছায়। পরিণত বয়সি ছেলে হরিদাস তার উড়নচণ্ডী। এ নিয়ে তার বেদনা অনেক, রাগও অনেক। সে রাগ ভূষণ ঝেড়ে ফেলে তার চেয়েও দুর্বল তার স্ত্রীর ওপর। আসলে ভূষণ যে যুদ্ধটা করে, সেটা দারিদ্র্যের সঙ্গে, দেশের জন্য যুদ্ধ করার শক্তিটা তার কই? তার নিরীহত্ব কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়। সে দরিদ্র আবার সংখ্যালঘু। এসব কিছুই সমাজের তলানিতে তার নিম্নবর্গত্ব নিশ্চিত করে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি সচেতনতা তার একেবারেই নেই। সে কেবল কাজ করে কোনোরকমে টিকে থাকতে চায় হয়তো-বা। কাজ করতে গিয়ে তিন জন মুক্তিযোদ্ধা তরুণের সাক্ষাৎ পায় সে। এ নিয়ে ভাবে : 'কী আরম্ভ হয়েছে দেশে– দুধের ছেলেরা বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' এ ছেলেরা যখন তাকে যুদ্ধে যাবার জন্য আহ্বান করে তখন সে আরো অবাক হয়! 'ভূষণ ব্যাপারটি ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। পুলিশের বন্দুক ওদের হাতে, একটা ভীষণ সাংঘাতিক কাণ্ড মনে হল তার কাছে।' কাজ শেষে দেড় টাকা আয় করে সে বাজারে যায়। সেখানে সে 'সুঁড়িপথ ধরে একজনের পর একজন উঠে' আসতে দেখে। তারপর জমজমাট বাজারে 'সে রক্ত দেখতে পায়, কোনো মানুষের মাথা থেকে, কারো পা থেকে, কারো কাঁধ, বুক বা পেট থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। রক্ত ছোটার কলকল ঝরঝর শব্দটাই যা ভূষণ শুনতে পায় না– কিন্তু দলে দলে মানুষ মাটিতে শুয়ে পড়ছে এটা সে দেখতে পায়'। এভাবে দেখতে দেখতে ভূষণ একসময় নিজের ছেলে হরিদাসকে দেখতে পায়, 'সমস্ত শরীর স্থির, শুধু চোখ দুটিতে তখনো আছে জীবনের তাপ'। সারা দিনের রাগ-অভিমান ক্ষুব্ধ চেতনা অবলুপ্ত হয় ভূষণের ছেলের ওপর।

ভূষণ তার মুখের ওপর মুখ নিয়ে আদরে ডাকল, বাবা হরিদাস, বাপ মানিক আমার– এই বলে সে তার রুক্ষ কর্কশ হাত ছেলের

গায়ে মাথায় অতি ধীরে বোলাতে বোলাতে অস্ফুটে আবার ডাকল, বাবা হরিদাস!

এরপর আবার যখন বিচ্ছিন্ন একটি আওয়াজ উঠল কড়াং করে, তখন ভূষণের চৌকো থামের মতো দেহটা বার দুয়েক ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে যেতে সে সমস্ত বোধের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

এ গল্প আমাদের একটা বার্তা দেয় যে, কোনো পক্ষ না হলেও যুদ্ধ মানুষকে পক্ষ করে নেয়। যুদ্ধ এমনই একটি নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া, যেখানে বেঁচে থাকাই বিস্ময়ের।

চার.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বয়ানগুলো নানামুখী। জাতীয়তাবাদী প্রকল্প যেমন এর একটি দিক, অন্যদিকে আছে ধর্মবোধ। তারও অন্যদিকে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার। সেলিনা হোসেনের 'আমিনা ও মদিনার গল্প' এমনই একটি ধারণাগত দিককে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পিত। আমিনা ও মদিনা দুই যমজ বোন। এক মসজিদের মুয়াজ্জিনের মেয়ে। মুয়াজ্জিন মেয়ে দুটোর প্রতি প্রসন্ন, কারণ লেখক বলছেন :

ওরা মাথায় কাপড় দিয়েছে, গায়ে পুরো হাতের ব্লাউজ, দৃষ্টি নিচের দিকে। মেয়ে দুটো ভারি লক্ষ্মী। নিয়মিত নামাজ রোযা করে। কোরআন শরীফ খতম করে। নম্র, ভদ্র। মুখে রা নেই। চোখ তুলে কথা বলে না।...গাঁয়ের লোক জানে এ গ্রামে আমিনা ও মদিনার মতো রূপবতী কেউ নয়। মেয়েরা এতই সংযত যে এখন পর্যন্ত কোনো দিন কোনো যুবকের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে বলে মুয়াজ্জিন শোনে নি। ওদের মা ওদের কড়া নজরে রাখে। এখন মুয়াজ্জিন ভালো পাত্রের অপেক্ষায় আছে।

লেখক এখানে একটা ধারণা তৈরি করতে চেয়েছেন মেয়েদের দিয়ে। সে ধারণা আমাদের সামাজিক প্রথাগত আদর্শবোধ-তাড়িত ধারণা। সে ধারণায় নারীর রূপ কেমন হলে সে সামাজিক মানুষ হিসেবে আদর্শরূপে প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। মুয়াজ্জিনের ধর্মবোধও এর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। মুয়াজ্জিন আলআমিনও একসময় গান শিখতে চেয়েছিল। তার পিতার বিরোধিতায় পারেনি। সে পিতার নির্দেশে মাদ্রাসায় পড়তে চলে যায়। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট এ গল্পের একটা ন্যারেটিভ বলা যায়। লেখকের নিজের একটা দৃষ্টিকোণ আছে। সেটা এখানে প্রকাশিত। মুয়াজ্জিন যেভাবে ইসলামকে দেখে, সেভাবে মসজিদের ইমাম দেখে না। যুদ্ধে রাজাকারদের সহযোগিতায় দুই মেয়েকে পাকিস্তানি মিলিটারি তুলে নিয়ে গেলে মুয়াজ্জিন প্রথমে ইমামের কাছে যায়। ইমাম তাকে বলে, 'এসব ইমানের পরীক্ষা।...এই দেশে ইসলাম বিপন্ন। এটা রক্ষা করা সবার দায়িত্ব। আপনি শুধু মেয়ে দিয়েছেন। এরপর জীবনও দিতে হবে।' ইমামের এ ভাষার সঙ্গে আমরা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের ভাষার কোনো পার্থক্য পাই না। চেয়ারম্যান বলে, 'আমাদের সবার উচিত ঝাঁপিয়ে পড়ে এই দুর্যোগের মোকাবেলা করা। বাবা ঘরে যাও। তোমার মেয়েরা পাকিস্তান রক্ষা করেছে।' একটি প্রতিকারহীন নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারে বাংকারে নির্যাতিত এ দুটো মেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনে স্বপ্নের ভেতরে ডুবে যায়। এ গল্পের একটা দুর্বল দিক একটা নিষ্ঠুর অমানবিক নির্যাতনের মধ্যে ওরা যে স্বপ্নটা দেখে সেটা আসলে নিরেট স্বপ্নই, বাস্তব থেকে অনেক অনেক দূরে এর অবস্থান :

দুবোন জেগে থেকেও স্বপ্নের ভেতরে ডুবে যায়। সুপুরুষ এক যোদ্ধা ওদের করোটির ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে সব লজ্জা আড়াল করে দেয়ার জন্য। দুবোনের শরীরে অদ্ভুত শিহরণ– এমন আনন্দ ওদের ষোল বছরের জীবনে এই প্রথম।

'নচিকেতাগণ' গল্পে কায়েস আহমেদ আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা একজন ব্যক্তির কথা বলেন, যে কিনা ভারী বুটের শব্দ শুনতে শুনতে প্রকৃতি দেখে। সে দৃশ্যটা এমন :

বাইরে ভারী বুটের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। চড়ুইটা উড়ে গেল, আমি শূন্যদৃষ্টি মেলে তার সেই অবাধ উড়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দরজা খোলার শব্দ পেলাম।

এটা গল্পের শেষ। এ ভাষা প্রতীকী ও ইঙ্গিতময়। এখানে চড়ুইটার উড়ে যাওয়া অপেক্ষমাণ এ যুবকের মনের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। বন্দিরা প্রত্যেকে একেক জন নচিকেতা যেন। নচিকেতা ক্ষণজীবী যে জাগতিক ইচ্ছা, তা প্রত্যাখ্যান করা শেখে। আত্মার মুক্তির সাধনা করে। দীপু ছোট ভাই, সে যুদ্ধে গেছে আর বড় ভাইকে ধরে নিয়ে এসেছে পাকিস্তানিরা। একটা ছোট কক্ষে অনেককে আটকে রেখেছে। তাদের সেখানে অবস্থানের যে বর্ণনা আমরা পাই, সে বর্ণনা নিষ্ঠুরতার। সেও অপেক্ষা করে কখন আসবে তার পালা। হয়তো নির্যাতনের নতুবা নির্মম মৃত্যুর। কিন্তু তার পালা আর আসে না। অপেক্ষাটাই এখানে বেদনাকে আরো প্রলম্বিত করে। গল্প যখন শেষ হয় তখনো সে নিশ্চিত নয়। তবু তার অপেক্ষার পালা শেষ হয় গল্পটা শেষ হবার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পাঠকের অপেক্ষা আর শেষ হয় না। এ গল্প যে বিষণ্ন বেদনার ছবি তুলে ধরে তার বাইরেও একটা বয়ান আমরা পেয়ে যাই। যখন উত্তমপুরুষে এ লোকটি ঢাকা শহরে ধীরে ধীরে প্রতিরোধের ছোট ছোট ঘটনা প্রকাশ করে। স্মৃতিতে তুলে আনে। নচিকেতাদের এ উত্থান তখন নিরর্থক এ অপেক্ষা আর বেদনা বহনের বিপরীত গল্পটাও পাঠকের সামনে নিয়ে আসে। আশ্বস্ত করে আসন্ন প্রতিরোধের। কায়েস আহমেদ শুধু গল্প বলেন না। নিজের মতো করে একটা আঙ্গিকও গড়ে তোলেন। উত্তমপুরুষে গল্পটা বলতে গিয়ে ঢাকা শহরের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধের ছবিটা মূর্ত করেন কুশলতায়।

হুমায়ূন আহমেদের 'জলিল সাহেবের পিটিশন' মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের গল্প। কিন্তু এ গল্প মুক্তিযুদ্ধকে আমাদের সামনে আরেক বাস্তবতায় তুলে আনে। মুক্তিযুদ্ধে হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানিরা কেবল প্রতিপক্ষ ছিল না। ছিল সে সময়ের এ দেশের একটা জনবিচ্ছিন্ন অংশ। এদের পরিচয় ও উল্লেখ আমরা আগের গল্পগুলোতে পেয়েছি। হুমায়ূন আহমেদ এ গল্পে এদের বিষয় করে তুলেছেন। আসলে মুক্তিযুদ্ধ যে বিষয়গুলোর সমাধান দিতে পারেনি; হুমায়ূন আহমেদ সে বিষয়গুলোর একটি সামনে নিয়ে আসেন। জলিল সাহেব একটি আবেদন উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় যেটি পিটিশন আমাদের কাছে সেটি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। গণ্যমান্যদের স্বাক্ষর নিতে চেষ্টা করেন। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। মানুষ এখন নতুন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আত্মমগ্ন। অতীত নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? আমরা বলি, যে প্রধান বৃত্তান্ত সামনে নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তার বিপরীত দিকে চলতে গিয়ে মানুষের মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। সে সময়ে জলিল সাহেবের কথা শোনার সময় কোথায়? জলিল সাহেব বলতে চান,

আমার দুটি ছেলে মারা গেছে, সে জন্যেই যে আমি এটা করছি তা ঠিক না। আমার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। ওদের মৃত্যুর জন্যে আমি কোনো বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্যে যাদের ওরা ঘর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে।...

আপনি কি মনে করছেন আমি ছেড়ে দেব? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দেব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেব। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লাখ লোক মারা গেল আর কেউ কোনো শব্দ করল না? আমরা মানুষ না অন্য কিছু বলেন দেখি?...

অনেকেই মনে করে আমার মাথা ঠিক নাই। এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব দেখাই করলেন না। ছোকরা মতো একটা ছেলে বলল, কেন পুরোনো কাঁসুন্দি ঘাঁটছেন? বাদ দেন ভাই। আমি তার দাদার বয়সী লোক, আমাকে বলে ভাই।

জলিল সাহেবের উক্তিগুলোতে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতার একটা চিত্র আমরা পেয়ে যাই। জাঁ ফ্রান্সিস লিওতার বলেন যে, প্রতিটি বিপ্লবের এক বা একাধিক গ্রান্ড ন্যারেটিভ থাকে। ফরাসি বিপ্লবের যেমন ছিল। সে ন্যারেটিভ সে সময় কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু গ্রান্ড ন্যারেটিভ এখন আর কার্যকর নয়। উত্তর-আধুনিক বাস্তবতায় গ্রান্ড ন্যারেটিভ অকার্যকর হয়ে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী তৎপরতা লিওতারকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেন। মুক্তিযুদ্ধের গ্রান্ড ন্যারেটিভ যাকে আমরা প্রধান বৃত্তান্ত বলেছিলাম শুরুতে সেটা প্রায় অকার্যকর হওয়ায় তার প্রভাব জনমনস্তত্ত্বে এমন গভীর প্রভাব ফেলেছে যে জলিল সাহেবের ন্যায্য কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেছে প্রায়। গল্প শেষে আমরা সন্তানহারা এ পিতাকে দেখি বিচার না পেয়ে মরে যেতে। তার ১৪ বছরের নাতনিকে দেখি দাদার পিটিশনটা যত্ন করে রেখে দিতে, কোনো একদিন একজন এগিয়ে আসবে এ আশায়। সে প্রতীক্ষা আর শেষ হয় না। লেখক বলছেন :

জলিল সাহেবের নাতনিটি হয়তো অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দাদুর পিটিশনের ফাইলটি ধুলো ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখে। এই বয়সী মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।

মুক্তিযুদ্ধের গল্প পাঠে আমরা পাচ্ছি নানামুখি বয়ান। নারী নির্যাতন, নারীর প্রতিরোধ, তারুণ্যের প্রবল অংশগ্রহণ, দেশপ্রেম, ব্যক্তির দুঃসহ ভেঙে পড়া, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিচিত্র প্রবণতা, নিম্নবর্গত্বের স্বর– যা প্রতিরোধে বেগবান এবং একটি দেশের ওপর নেমে আসা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে একটি জাতির গড়ে ওঠা, যা সম্ভব করে তুলেছিল একটি নতুন রাষ্ট্র। ছোটগল্পগুলোর নিবিড় পাঠের মাধ্যমে ছোট ছোট বয়ানগুলোও উঠে এসেছে । ফলে এগুলোর নিবিড় অধ্যয়নের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক একটি পাঠ নির্মাণ করা সম্ভব।

তথ্য সংকেত :

- আনিসুজ্জামান, ২০১২। বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।
- আনিসুজ্জামান, ২০১৯, সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
- হাসনাত, আবুল। ২০১৮, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, ঢাকা।
- Buchanan, Ian. 2010. Critical Theory, Oxford University Press. New York.

লেখক : উপাধ্যক্ষ, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

বিজ্ঞাপন এজেন্সি তালিকাভুক্তির আবেদন

সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- বিজ্ঞাপনী সংস্থার হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স*
- প্রতিষ্ঠানের টি.আই.এন (TIN) সনদ*
- প্রতিষ্ঠানের বি.আই.এন (BIN) সনদ*
- প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট (VAT) রেজিস্ট্রেশন সনদ*
- স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি *
- প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ব্যাংক সনদ/ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র *
- যেসব সংস্থার সাথে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে দুটি সংস্থার প্রত্যয়ন পত্র*

সেবার ফি

বিনামূল্যে

সেবা প্রদানের সময়সীমা

৭ কার্যদিবস

আবেদন ফরম পূরণের নিয়মাবলী

১. আবেদন ফরমের লাল তারকা (*) চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করুন। অন্যান্য ঘর পূরণ ঐচ্ছিক।
২. আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হলে সংরক্ষণ করা যায় এবং পরবর্তীতে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে ড্রাফট আবেদন পুনরায় শুরু করা যাবে।
৩. আবেদন দাখিলের পর প্রতিটি আবেদনের জন্য একটা স্বতন্ত্র ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করা হবে, যেটি ব্যবহার করে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে আবেদনের অগ্রগতি জানা যাবে।

সেবাটি পেতে প্রবেশ করুন এই লিংকে
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1712031764

এই দেশ এই মানচিত্র

জামসেদ ওয়াজেদ

জননী আমার তুমি– এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নয়
তুমিতো মৃত্তিকা মাগো যে বলয়ে গড়ে ওঠা আমার শরীর
হাজার স্মৃতি কষ্ট জড়ো কাঁটাশূল বেদনার তীর
তুমি সত্য তুমি আলো আকাশ উদার

নিজ হাতে অগ্নি জ্বেলে সে অনলে করি বসবাস
ভুলকে সঠিক ভেবে পড়ে যাই পিছে
শুনেছি লোকের মুখে বেহেশত জননীর পায়ের নিচে
মায়ের এ আশির্বাদে হয়তো হতে পারি ইতিহাস

জননী আমার– যার কাছে এই দেশ মানচিত্র ঋণী
একটি বুলেট শুধু মৃদু শব্দে খুলে ফেলে যে নাকের ফুল
তুমিতো সঠিক মাগো বাদবাকী পৃথিবীর সব স্মৃতি ভুল
অমূল্য সম্পদ এক– যা হয় না কোনোদিনো হাটে বিকিকিনি

শূন্যতায় পুড়ে পুড়ে এই মন তাই আজ হয়েছে পাথর
তোমারি পবিত্র মনে আমারি পতাকা যেন সুগন্ধি আতর

নির্জনবিন্দু

মহসিন আহমেদ

ব্যক্তিগত নির্জনতার ভেতর অপ্রত্যাশিত অনুরণন
মাকড়শাময় সময়
কাঁচঘরে বন্দি বোধের অঙ্কুর
পাতালপুরীর রহস্যের গল্প শুনতে শুনতে
নিজের অজান্তেই ঢুকে যাই আপন আমাজনে
জানিনা দুর্বোধ্য এ পথ বিলুপ্তপ্রায় কোনো নগরে নিয়ে যাবে কি-না
প্রাচীনতম জেরিকোর প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়াবার সাধ ছিলো যদিও

পিকাসোর প্রচ্ছদ ঘুণেধরা বিবেকের কাছে বিকৃত আজ
চানাচুর, ঝালমুড়ি কিংবা শুটকির দুর্গন্ধযুক্ত ঠোঙায়
নিশব্দে গড়িয়ে পড়ে তাঁর দু'চোখের জল
যে নির্জনবিন্দুর ভেতর শুধু নাশপাতির অনুপ্রবেশ ছিল
সেখানে সহসাই ঢুকে যায় বোমারু বিমানের বিষাক্ত কার্বন

শুধুই এখন, একান্ত জলের বিন্যাস

রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ড. মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী

'রমজান' মহান আল্লাহ প্রদত্ত অপূর্ব রহমতের মাস। বারো মাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে রমজান মাস। মুসলিম জাতির জন্য মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামতসমূহ এ মাসে বরাদ্দ রেখেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এ মাসে নাজিল হয়েছে। কুরআনুল কারিমের বরকতে রমজান মাস সকল মাসের সেরা মাসে পরিণত হয়েছে। রমজান মাসে আল্লাহ তা'আলা বহুমুখী ইবাদতের ব্যবস্থা রেখেছেন। আন্তরিকতা ও ইখলাসের সঙ্গে এ ইবাদতসমূহ পালন করলে একজন মুসলমানের পরকালীন জীবন সমৃদ্ধ করা এমনকি ইহকালীন জীবন চলার পথেও আল্লাহর রহমতের ছায়া পাওয়া খুবই সহজ হয়ে যায়। তাই রমজান মাস মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

পবিত্র রমজান মাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন : রমজান মাস। এ মাসে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। আর পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না। এজন্য যে, তোমরা সংখ্যাপূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো (সুরা বাকারা, ১৮৫)।

যেকোনো কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ দরকার। রমজান মাসে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের একটি সুন্দর পরিবেশ ও আবহ তৈরি করে দেন, যা অন্য কোনো মাসে হয় না। রসুলুল্লাহ (স.) এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, রমজান মাসের প্রথম রাত যখন আগমন করে তখন শয়তানদের এবং অবাধ্য জিনদের শিকল পরিয়ে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা এ মাসে আর খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। এ মাসে এগুলো আর বন্ধ করা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী বলেন : ওহে কল্যাণ অনুসন্ধিৎসু, তুমি কল্যাণের পথে এগিয়ে আস, ওহে পাপে লিপ্ত ব্যক্তি, তুমি পাপ হতে বিরত হও। আর আল্লাহ তা'আলা অনেক লোককে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন। এটা রমজানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে (মিশকাত, পৃ. ১৭৩)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন– এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, যে এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো (মিশকাত)।

রমজান মাসে একটি নফল ইবাদত করলে একটি ফরজ ইবাদতের সাওয়াব দেওয়া হয়। আর একটি ফরজ আদায় করলে ৭০টি ফরজ ইবাদতের সাওয়াব দেওয়া হয়। রমজান মাস হচ্ছে ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাস হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধের

মাস। এ মাসে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় (মিশকাত)।

রমজান মাসের রোজা ইসলামের অন্যতম পঞ্চভিত্তির একটি। রমজান মাসের একটি রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ভঙ্গ করলে ষাটটি রোজা লাগাতরভাবে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, এ মাসের একটি রোজা ভঙ্গ করলে অন্যসময়ে যুগ যুগ ধরে রোজা রাখলেও এ মাসের রোজার সমান ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উচিত যথাযথভাবে রমজানের রোজাসমূহ আদায় করা।

রমজান মাসের রোজা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ছাওয়াবের নিয়্যাতে আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা রোজাদারের পিছনের জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। রমজান মাসের রোজা, সেহরি, ইফতার, তারাবি, শবেকদর, জুমাতুল বিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যা অন্য মাসে নেই। এ সকল ইবাদত হচ্ছে ইমানদারের শোভা। একজন মুমিনের জীবনে এ ইবাদতসমূহ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। কোনো মুমিন মুসলমান যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ ইবাদতসমূহ পালন করলে তার ইহকালীন ও পরকালীন জীবন কল্যাণময় করা খুবই সহজ। এ মাস হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুমিনের প্রতি বিশেষ উপহার। তাই আমাদের উচিত রমজানের রোজাসমূহ যথাযথভাবে পালন করা এবং রমজান সংশ্লিষ্ট ইবাদতসমূহ যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে ও আন্তরিকতার সঙ্গে আদায় করা। অন্যথায় আমাদের পরকালীন জীবন বিপৎসংকুল হয়ে যাবে, যা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

রোজার মূল উদ্দেশ্য তাক্ওয়া অর্জন করা। সংযম অবলম্বন করা, অপ্রয়োজনীয় কথা বা কাজ পরিহার করা। আল্লাহর নাফরমানি হতে দূরে থাকা। বস্তুত যে রোজা তাক্ওয়া তথা আল্লাহর ভয় ও হৃদয়ের পবিত্রতাশূন্য সে রোজা যেন প্রকৃত অর্থে কোনো রোজাই নয়। আল্লাহ তা'আলার নিকট এসব রোজার কোনো গুরুত্ব নেই যদি রোজা রেখেও মিথ্যা কথা বা খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। মানুষকে ঠকানোর মনমানসিকতা পরিহার করা না হয়, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো বন্ধ না করা হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ইচ্ছাকৃতভাবে আকাশচুম্বী করা হয়, তাহলে এ লোককে সত্যিকারে রোজাদার বলা যায় না। এজন্য রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই (মিশকাত)।

যে কাজ রোজার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থি, রোজা অবস্থায় এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও রসুলুল্লাহ (সা.) জোর তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, রোজা অবস্থায় তোমাদের কেহ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় তবে সে যেন বলে আমি রোজাদার। রোজাকে প্রাণবন্ত করতে হলে যেমনিভাবে জিহ্বার হেফাজত জরুরি অনুরূপভাবে চোখ, কান এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিফাজতও তেমনি জরুরি। হারাম জিনিস দেখা, নিষিদ্ধ কথা শ্রবণ করা এবং হারাম কাজ করা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখা একান্ত আবশ্যক। তবেই রোজার স্বাদ অনুভূত হবে এবং রোজাও প্রাণবন্ত হবে।

রোজার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করার জন্য অন্যতম শর্ত হলো হালাল বস্তু দ্বারা আহার করা, পক্ষান্তরে, হারাম বস্তু খেয়ে রোজা রাখলে এতে নফসের পাশবিকতা অবদমিত হওয়ার পরিবর্তে তা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠবে। রোজা অবস্থায় সেহরি ও ইফতারের সময় পরিমিত আহার করাও জরুরি। রোজার কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল করতে হলে নিষিদ্ধ কার্যসমূহ পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নেক আমলের প্রতিও বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। তাই রোজাদার ব্যক্তিকে নফল ইবাদত, তেলাওয়াত, জিক্র ও তসবিহে নিমগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতার মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণ ও কামিয়াবির পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

রমজান মাসের রোজার শারীরিক এবং আত্মিক অনেক উপকারিতাও রয়েছে। শারীরিকভাবে পরিণীত আহারের অভ্যাস গড়ে তোলা সহজ হয় রমজান মাসে। ফলে নানারকম রোগ ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়া যায়। আমাদের শরীরে অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি হয় অতিরিক্ত ভোজনের কারণে, রমজান মাসের রোজা রাখার মাধ্যমে পরিমিত আহারের অভ্যাস গড়ে তুললে এ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

আত্মিক উন্নতি সাধন করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার এবং ফেরেশতার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে রমজানের রোজা আদায়ের মাধ্যমে। তাছাড়া রোজার দ্বারা প্রবৃত্তির ওপর আমলের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয় এবং রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে মানুষের জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা হ্রাস পায়। এতে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় এবং অন্তর বিগলিত হয়। মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি হয় হৃদয়ে।

রোজার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি এবং তাক্ওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্বের ধারণা জাগ্রত হয়।

রোজার দ্বারা মানব মনে এমন নুরানি শক্তি সৃষ্টি হয় যার দ্বারা মানুষ সৃষ্টির এবং বস্তুর গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়। তাছাড়া রোজার বরকতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা যে ব্যক্তি কোনো দিনও ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকেনি সে কখনো ক্ষুধার্ত মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারে না। অপরদিকে কোনো ব্যক্তি যখন রোজা রাখে এবং উপবাস থাকে তখন সে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তারা যে, কত দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছে। আর তখনই অনাহারক্লিষ্ট মানুষের প্রতি তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হয়। রোজা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। তাই রোজা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হিফাজত করে।

অতএব, রমজান মাস, রমজান মাসের রোজা তার আনুষঙ্গিক ইবাদত মুসলিম জনগণের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সুষমামণ্ডিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের সকলেরই উচিত যথাযথ মর্যাদা ও আন্তরিকতার সঙ্গে রমজান মাস ও এ মাসের রোজাসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা।

লেখক : পরিচালক, ইসলামি ফাউন্ডেশন

স্বাধীনতার হিসেব নিকেশ

জিন্নাত আরা ইফা

স্বাধীনতার অনেকগুলো বছর পেরিয়েছি আমরা-
এখনই সময় হিসেব করার:
শহীদের রক্তের দাম সত্যিই কি আমরা দিতে পেরেছি!

পেরেছি কি স্বাধীন অধিকারের অধিকার রক্ষা করতে?
পরাধীনতার শৃঙ্খল
কি সত্যিই ভাঙতে পেরেছি- নিজের বা-অন্যের.....

নিজেকে স্বাধীন করার তাগিদে
অন্যকে পরাধীনতার শিকলে বেধে যাচ্ছি
চেতন বা অবচেতন মনে,
তার অনুভূতি কি আমাদের জাগ্রত?

কি পেয়েছি সেটা বড় কথা নয়-
কি দিয়েছি বা দিতে চাই সেটাই বড় কথা...
দেশ তো কারো একার নয়;
তবে একা কেন স্বাধীনতা ভোগের স্বার্থপর ভাবনা,

স্বাধীনতা- এ তো সবার সমান অধিকার,
এ কথা করো ভুলবার নয়।

ভালো রাখি দেশ,
দাম দিয়ে যাই শহীদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটার
যতটা দিতে পারি মিলে সকলে....

সকল শহীদের প্রতি জানাই শ্রদ্ধাশীল ভালোবাসা
তারা ভালো থাকুক ওপারে, জান্নাতুল ফেরদৌসে....

অবিশ্বাস্য রেজু চাচা: এক গ্রামীণ সমাজে সুফিবাদের অন্বেষণ

মোহাম্মদ রশীদুজ্জামান

অনুবাদক: জি এইচ হাবীব

এক শেষবিকেলের কথা মনে পড়ে আমার, খুব সম্ভবত ডিসেম্বর মাস তখন; ফসল-কাটার মৌসুম কার্যত শেষ, কেটে-নেওয়া ধানগাছের অবশিষ্টাংশে মুখ লাগিয়ে বেড়ানো একপাল ছাগল আর বেশ কিছু গরু ছাড়া ধূসর ফসলের মাঠগুলো খালিই একরকম। এক ঝাঁক সাদা বক ফসল-কাটার মৌসুম শেষ হতে না হতেই ধানখেতের ভেজা ফটালে আশ্রয় নেওয়া ব্যাঙগুলো দিয়ে উদরপূর্তি করছে। বিকেল আর সন্ধ্যার মাঝের সময়টা চমৎকার ঠান্ডা; গ্রামবাংলায় শীত এসে পড়েছে, আর নিঃসঙ্গ পথচারীরা– তাদের দু-এক জনের গলায় গরম কাপড় জড়ানো– ধানখেতের আঁকাবাঁকা আলপথ ধরে ধীর পায়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। খোলা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে সেই নদীর বাতাসে ভেসে আসা গন্ধটির কথা খুব করে মনে পড়ল। যে-গন্ধ বা ঘ্রাণ ফসল-কাটার বিরতির আগে সোনালি ধানগাছগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যায়। বরষার শেষে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ঘন নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে, যদিও বাতাসের খানিকটা ঠান্ডা ভাব ছাড়া প্রকৃতির দিকে আমি ততটা খেয়াল করছিলাম না। সেই ঋতুকে ঘিরে ফসল কাটা পরবর্তী চমৎকার সময়টা গ্রামবাংলার লোকজন বেশ উপভোগ করছিল; ভয়ানক গরম ও আর্দ্রতা তখন বিদায় নেওয়াতে– যদিও বেশিদিনের জন্য নয়– পরিবারের লোকজন, বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন মিলে নতুন ধানের চাল দিয়ে বানানো মজার মজার খাবার খাচ্ছিল।

এরই মধ্যে হঠাৎ করে, যেন একেবারে শূন্য থেকে, আমার সামনে এক মধ্যবয়েসি মানুষ উদয় হয়ে আমার বাবার কথা জানতে চাইলেন। তিনি আমার নিঃসঙ্গতার আবেশটা ভেঙে দিলেন।

নিজের সঙ্গে আমি আমার বাবা-মা, আমার ছোট ভাইবোন-সংক্রান্ত হতাশার যেসব একঘেয়ে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম, তিনি তাতেও বাগড়া দিলেন। আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম কেন তিনি বাবার খোঁজ করছেন। মনে হলো, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক বালকের প্রচ্ছন্ন ঔদ্ধত্যে তিনি খানিকটা আহত বোধ করলেন; তার

পরও ভদ্রতা বজায় রেখে বললেন, 'বাবা, তুমি বুঝবে না। আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই; এটা একটা ব্যক্তিগত বিষয়, আর বড়দের ব্যাপার।' বেড়াতে আসা আত্মীয়স্বজন ও গুটিকতেক প্রতিবেশী– যারা পরনিন্দা-পরচর্চা করে, অলস গুলতানি মেরে, আর চলতি ঘটনাবলি, ধর্ম ও ইতিহাসের টুকরো-টাকরা নিয়ে কাছারি ঘরে আড্ডা জমাতে আসতেন– তারা ছাড়া আরো দু-ধরনের মানুষ আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন : হয় তাঁর ছাত্ররা, আর নয়তো তাঁর ছাত্রদের বাবা-মায়েরা, এবং আরেক ধরনের অতিথি, যাঁরা আমার মায়ের খুব একটা পছন্দের ছিলেন না– এক রাত বা আরও বেশি সময়ের জন্য থাকতে আসা কোনো মুসাফির বা আশ্রয়প্রার্থী পথিক। অবশ্যই, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন অ-আমন্ত্রিত। এ ধরনের মুসাফিরের মধ্যে ছিলেন দরবেশ ও সাধু বা বাউল। আমি তাঁদের দেখলেই চিনতে পারতাম; তাঁদের বেশির ভাগেরই লম্বা চুল-দাড়ি আর রুদ্রাক্ষের মালা থাকত। একবার এক সুফি ফকির গভীর রাতে বিরাট একটা লণ্ঠন হাতে এসে হাজির হলে আমাদেরকে বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হয়েছিল; তার গলায় ছিল লাল টকটকে একটা মাফলার আর হাতে বড় একটা বাঁশের লাঠি। মাঝে মাঝে কপালে তিলকচিহ্নিত দু-এক জন সন্ন্যাসী রাতে থাকার জন্য আসতেন; সেসব আগন্তুকের কারো কারো সঙ্গে লোকসংগীত গাওয়ার বাদ্যযন্ত্র থাকত। কিন্তু এই ভদ্রলোকের কাছে সেগুলোর কিছুই ছিল না। আমার কৌতূহল হলো : কে ইনি? আমি ভাবলাম, ইনি নিশ্চয়ই আমার বাবার ফেল-করা ছাত্রের বাবা হবেন।

অনীহা সত্ত্বেও আমি তাঁকে বারান্দার কাঠের বেঞ্চে বসাই, এবং তারপর বাড়ির ভেতর চলে যাই। বাবা তখনো নামাজ পড়ছিলেন, লম্বা সময় নিয়ে নামাজ পড়তেন তিনি। তাই আমি মাকে বললাম, 'বাবার সঙ্গে দেখা করতে একজন লোক এসেছেন।' আমি ঘোষণা শেষ করতে না করতেই মা-র ত্বরিত প্রশ্ন, 'কেমন লোক?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি ফের জানতে চাইলেন, 'আরেক মুসাফির নাকি?'

খানিকটা বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'আমি কী করে জানব? তিনি ফকির (মানে আধ্যাত্মিক ভবঘুরে) না, সাধু (কৃচ্ছ্রসাধনকারী) না, বাউলও (বাংলা বা বাংলাদেশের মরমি গায়ক) না। সাধারণ একজন লোক বলেই মনে হলো মা।' আমি তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম। মা বলে উঠলেন, 'আচ্ছা!'

আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার কথায় তিনি এটি ভেবে স্বস্তি পেলেন যে তাঁকে বাড়তি একজন বা দুজনের জন্যে রাঁধতে হচ্ছে না। বাবার নামাজ শেষ হলে মা তাঁকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে একজন লোক এসেছেন। আশা করি তিনি আপনার ওইসব ফকির বা দরবেশদের কেউ না।' বাবা মাকে তেমন কিছু না বলে বাংলোর দিকে এগোলেন।

মা কিন্তু তখনো পুরাপুরি আশ্বস্ত হননি; তিনি আমাকে বললেন– যেন আমি গিয়ে দেখে আসি আগন্তুক দু-এক রাত থাকতে চান কি না। আমি আমার মায়ের আশঙ্কার কারণটা জানতাম। আমাদের কাছারিঘরটাকে লোকজন গাঁয়ের পান্থনিবাস বলত। সে সময় বাংলাদেশের গ্রামে কোনো হোটেল বা মোটেল ছিল না : সফরকারীরা মানুষজনের তাঁদের বাড়িতে থাকত। তার পরও, রাতে বিনে পয়সায় থাকতে দিতে পারে এমন মানুষজন কমই ছিল। তবে আমার বাবা আমাদের কাছারিঘরে লোকজনকে আশ্রয় দিতে পছন্দ করতেন এবং গ্রামের লোকেরাও সে কথা জানত। কাজেই, যখনই কোনো আগন্তুক রাতে থাকার জায়গা খুঁজত, তারা স্বভাববশতই বলত, 'মাস্টার সাহেবের বাড়ি যাও।' আর তারা সেখানেই আসত। তখন আমার মায়ের কাজ হতো বাড়ির খেয়ালি গৃহপরিচারিকা মকবুলের মাকে সেই অতিথির জন্য রাঁধতে ঠেলাঠেলি করা। মাঝে মাঝে আগন্তুকেরা সঙ্গী-সাথি নিয়ে আসতেন– গায়ক আর মারফতি (আধ্যাত্মিক) গানের লোকজন। আর– তার অর্থ একগাদা লোকের জন্য রান্না করা! আমি এগুলো সব জানতাম, আর তাই মায়ের জন্য আমার সহানুভূতি ছিল এবং আমার ভালো লাগত না এই আগন্তুকদের উৎপাত, কারণ তার মানে ছিল মা-র জন্য বাড়তি কাজ। কিন্তু মায়ের প্রতি আমার এই পক্ষপাত আমি প্রকাশ্যে দেখাতাম না; নিজের মধ্যেই রাখতাম। মায়ের জন্যে না হলেও দু-এক বার আমি আমার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম, বলেছিলাম, 'আপনার মেহমানদের কারণে আমার পড়ার ব্যাঘাত ঘটে।' কারণ বাংলোটা আমার পড়ার ঘরও ছিল কিনা। সম্প্রতি, আমার এক জ্ঞাতি ভাই এসেছে আমাদের সঙ্গে থাকার আর স্কুলে পড়াশোনার জন্যে; সে আমার সহপাঠীও ছিল। প্রায় চার বছর সে আমাদের সঙ্গে ছিল।

ধীরে ধীরে দরবেশ এবং সাধুদের ব্যাপারে বাবার উদার আমন্ত্রণ কমে এলো। তবে একবার এক অতিথি আসাতে আমাকে আমার ক্রন্দনশীল অনুজ বোন ও ভাইয়ের কাছ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র আশ্রয়স্থল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম। আসলে একজন দরবেশ আমার ঘরে বসে নামাজ-কালাম করতে পছন্দ করতেন; কিন্তু সবচাইতে যেটা খারাপ বিষয়, তিনি আমাকে একবার ধূমপান করতে বললেন, শুধু সিগারেট নয়, গাঁজাও (মারিজুয়ানা)। বাউলরা এলে খোলা একটা ঘরে তাঁরা গান-বাজনা করতেন। এক সাধু ছিলেন, তিনি তাঁর কল্কিতে দম দিতেন শুধু, কথাবার্তা তেমন কইতেন না; তাকে দেখতে অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী আর মুসলিম দরবেশের একটি মিশ্রণ বলে মনে হতো। আমার জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাইয়েরা এই বলে কানাকানি করতেন যে তিনি আসলে একজন তান্ত্রিক পূজারী এবং আমাদের বাড়ির অনতিদূরে নদীর ধারে হিন্দুদের শশ্মানে তার যাতায়াত আছে। আমার ধারণা, ১৯৪৭-এর পর তিনি আমাদের বাড়িতে তেমন একটা আসতেন না। আর আরেক গাঁজাসেবী সন্ন্যাসীকেও বেশ রহস্যময় বলে মনে হতো। তিনি মুসলিম। তিনি হঠাৎ হঠাৎ উদয় হতেন, কয়েক দিন থাকতেন। আমার বাবা ধূমপান করতেন না; ধূমপানরত কারো সঙ্গ তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি জানতেন যে সাধুরা গাঁজা সেবন করতেন, তবে তাঁদের তিনি নিবৃত্ত করার তেমন একটা চেষ্টা করতেন না; দুয়েকটা রাত্রি যাপন করার জন্য আসতেন তাঁরা; সম্ভবত সেটাই ভাবতেন তিনি। সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিল না, যদিও নিয়ামত আলী ভাইয়ের সঙ্গে আমি গোপনে দুয়েক বার খেয়েছিলাম। আমার এই জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন।

আমার আগ্রহ ছিল সাধু লোকটি যে গাঁজা খেতেন সেই জিনিসটা নিয়ে। একবার তিনি আমাকে একটা টান দেবার জন্য আমাকে কল্কিটা সাধলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা কখনো ভুলিনি আমি। একবার টান দেবার পরেই আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল এবং আমি ভীষণভাবে কাশতে শুরু করলাম। আমি কল্কিটা তাঁকে

ফিরিয়ে দিলাম, এবং তাঁকে জিগ্যেস করলাম কেন তিনি এই ভয়ংকর জিনিসটা সেবন করেন। তাঁর ব্যাখ্যা সেদিন আমি বুঝতে পারিনি, তবে বেশ কিছুদিন পরে সেটার একটা ধারণা পেয়েছিলাম : আসলে তিনি গাঁজা খেতেন আধ্যাত্মিক তুরীয় ভাব অর্জন করার জন্য। মাঝে মাঝে আমার বাবা সেই সন্ন্যাসীকে বলতেন– 'কল্কির ওপর ভর করে আপনি আপনার আধ্যাত্মিক গন্তব্যে যেতে পারবেন না!' এ কথা অনুমান করতে আমার দেরি হয়নি যে, পরিচিত ক্যানাবিস-আসক্তরা ছাড়াও, ধর্মীয় কৃত্যমূলক কাজকর্মের পরিসরের মধ্যে মারিজুয়ানা (গাঁজা) সেবন একটা সহনীয় অভ্যাসের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু বাস্তবে যা-ই ঘটুক না কেন, ইসলামে তা অনুমোদিত নয়।

*** *** *** ***

এগুলো সবই আমাদের বাড়িতে সেই রহস্যময় মানুষটির আবির্ভাবের অনেক আগের কথা। আমি মানুষটির কথা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম : তিনি কি আরেক দরবেশ? আমার মনে হয়েছিল কোনো দরবেশ দেখলে আমি চিনতে পারব, কিন্তু এই অতিথি সম্পর্কে আমি জানব কী করে? আমি তখন এত ছোট যে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের কথা আমি কাউকে বলতে পারিনি, তাই নিজের মনেই সে কথা নাড়াচাড়া করতাম, যদিও অস্বস্তিটা মন থেকে যেত না। আর তাই, আমার বাবা আর লোকটি যখন বারান্দায় বসে কথা বলতেন তখন আমি আশপাশে ঘুরঘুর করতাম, তবে আমি যে আমার মায়ের হয়ে গুপ্তচরগিরি করছি এ কথা কখনো বুঝতে দিতাম না। আলাপে মশগুল থাকা অবস্থাতেই বাবা দুয়েক বার আমাকে খেয়াল করেন– একবার তিনি কথা থামিয়ে বলে ওঠেন, 'এঁকে চাচা বলো। সালাম দাও।' বাবার কথামতো কাজ করলাম বটে তবে ঘুরঘুর করাও বন্ধ করলাম না। তারা কী নিয়ে কথা বলছেন তা যে আমি খুব একটা বুঝতে পেরেছিলাম তা নয়, তবে সেসব কথাবার্তার কায়েকটা অনুরণন আমার মনের দীর্ঘদিন থেকে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'মাস্টার সাহেব, আমি আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ না, তার পরও, আমি আমি এলম (জ্ঞান) অর্জন করতে চাই– আমি আমার স্রষ্টা আল্লাহকে জানতে চাই।' আমার বাবা জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু আমি কেন? আমি তো কেবল সুফিদের লেখাপত্র, আর তাঁদের জীবন ও কাজকর্ম সম্পর্কে পড়ে অনুপ্রাণিত একজন মানুষ ছাড়া বেশি কিছু নই। আমি সন্ন্যাসী না। আমি একজন সাধারণ মানুষ। শিক্ষকতা করে খাই, এবং পরিবারের ভরণপোষণ করি। আমি কোনো পির না, কোনো পিরের কাছে যাইও না। কোনো মুরিদও গ্রহণ করি না। আপনি বরং কোনো মৌলভির কাছে গিয়ে কোরান-হাদিস শিক্ষা করুন। সেটাই ভালো হবে।' এরপর বাবা আরো বললেন, 'ধর্মীয় হেদায়েতের জন্য আমার মনে হয় আপনার কোনো পিরের কাছে যাওয়া দরকার।' উত্তরে সেই চাচা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি নামাজ পড়ি, মাঝে মাঝে কোরান তেলওয়াত করি, কিন্তু তার পরও আমি আরো অনেক কিছু চাই। আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমার একটা প্রবল আকুতি আছে, সেটা কেবল দৈনন্দিন নামাজ-কালামে মেটেনা।' এ কথার সঙ্গে আমার সেই নবলব্ধ চাচা বাবাকে আরো কিছু কথা বললেন। 'আমি প্রায় নিরক্ষর, কিন্তু আমি মওলানা রুমি, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং সাবেক কালের আরো অসংখ্য বড় বড় আধ্যাত্মিক নেতার কথা শুনেছি। আমার স্রষ্টা আল্লাহর কাছে পৌছানোর জন্য তাঁরা কী বলেছেন আমি তা জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমাকে আপনার বুকে টেনে নিন, এবং নিজের আরেক জন ছাত্র হিসেবে বিবেচনা করুন, যে কিনা আপনার নিয়মিত ছাত্রদের চাইতে বয়সে অনেক বড়।' আমার বাবা চুপ করে তার কথা শুনলেন। (ক্রমশ)

গ্রন্থ পরিচিতি: ঊনবিংশ শতাব্দীর গোধূলিলগ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় পুরো সময় অব্দি ভারতের ঔপনিবেশিক বাংলার মুসলমানরা একটি বিদেশি শাসন এবং সেটার বিভিন্ন দলগুলো সম্পর্কে নানান সন্দেহে আচ্ছন্ন ছিল। তাদের ধর্মীয়তা এবং আত্মপরিচয়-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বমুখর অস্তিত্বগত তাগিদ, সর্পিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, সামন্ততান্ত্রিক চাপ বা টানাপোড়েন এবং তথাকথিত ভদ্রলোকদের দ্বারা প্রান্তিকীকরণের অত্যন্ত জটিল একটি আবর্ত তাদের ঘিরে ধরেছিল। লেখক মোহাম্মদ রশীদুজ্জামান তাঁর একাডেমিক গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ের গবেষণাসহ বিচিত্র পরিসরের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণকে একত্রিত করে এই রচনাটি তৈরি করেছেন, যা দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসের একটি উপেক্ষিত অংশ : ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রামীণ মুসলমানের একটি আকর্ষণীয় হিস্টোরিওগ্রাফি তথা ইতিহাসতত্ত্ব।

বাস্তব জীবনের এই বিবরণ কাল্পনিক মানুষদের ভিত্তি করে রচিত হয়নি, হয়েছে ঊনবিংশ শতকের শেষ অংশ থেকে বিংশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধে লেখকের চারপাশের মানুষদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত পুরাতন ব্রিটিশ ভারতীয় বাংলা এই রচনার আন্তঃপ্রজন্মীয় আখ্যানে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লেখক পরিচিতি: মোহাম্মদ রশীদুজ্জামান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রফেসর এমেরিটাস। তিনি ব্রিটিশ শাসনামলের ভারত, পকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে বেশ কিছু প্রশংসিত গ্রন্থের লেখক। ১৯৬৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডের ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সাল অব্দি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করার আগে তিনি এক দশক কালের অধিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

বক্ষ্যমাণ রচনাটি বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা পিটার ল্যাঙ থেকে ২০২১ সালে প্রকাশিত তাঁর আইডেন্টিটি অভ আ মুসলিম ফ্যামিলি ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল : বিটুইন মেমোরিজ অ্যান্ড হিস্ট্রি গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ।

তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : দ্য সেন্ট্রাল লেজিস লেইচার অভ বাংলাদেশ ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ৯২১-১৯৪৭ : পার্লামেন্টারি এক্সপেরিয়েন্সেস আন্ডার দ্য রাজ (পিটার ল্যাঙ, ২০২০); পলিটিকস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন দ্য লোকাল কাউন্সিলস : আ স্টাডি অভ ইউনিয়ন অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলস ইন ইস্ট পাকিস্তান (১৯৬৮); এবং পাকিস্তান : আ স্টাডি অভ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিকস (১৯৬৭)। এছাড়াও, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মুসলিম আইডেন্টিটি, এবং রাজনৈতিক ইসলাম বিষয়ে পিয়ার রিভিউড বিভিন্ন জার্নালে তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদক : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ঈদের নামাজ

মো. ওমর ফারুক

ঈদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ খুশি বা আনন্দ। ঈদ বলতে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদকে বোঝায়। ঈদ শব্দটি আরবি উয়ুদ শব্দ হতে গৃহীত। এর অর্থ বারবার ফিরে আসা। যেহেতু ঈদ প্রতি বছরই ফিরে আসে এবং এলাকার লোকজন ঈদের মাঠে গিয়ে একত্রিত হয়ে কুশল বিনিময় করে আনন্দ লাভ করে তাই একে ঈদ বলা হয়।

ঈদের নামাজের হুকুম : ছয় তাকবরের সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব। এতে সকল ইমাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। রসুল (স.) মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের পর থেকে নিয়মিত তা আদায় করেছেন। কখনো তরক করেননি।

নামাজের ওয়াক্ত বা সময় : সূর্যোদয় হওয়ার পর হতে সূর্য মধ্য আকাশে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের যে কোনো সময় পড়তে হবে। সূর্য পশ্চিম দিকে চলে গেলে এ নামাজ পড়া যাবে না। কোনো কারণবশত সূর্য মধ্য গগনে উপনীত হওয়ার পূর্বে নামাজ আদায় করতে না পারলে ঈদুল ফিতরের নামাজ পরের দিন ওই ওয়াক্তে আদায় করা যাবে।

ঈদের নামাজের স্থান : ঈদের নামাজ জুমার নামাজের মত জামাতে পড়তে হবে। একাকী এ নামাজ আদায় করা যাবে না। জুমার নামাজ মসজিদেই আদায় করা হয়। তবে ঈদের নামাজ মাঠে পড়া উত্তম ও সুন্নত। বিনা ওজরে ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা মাকরুহ। ঝড়, বৃষ্টি তুফান, মাঠের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি কারণে ঈদের নামাজ মসজিদে পড়া যায়।

রসুল (স.)-এর জীবনে মাত্র একবার প্রবল বৃষ্টির কারণে ঈদের নামাজ মসজিদে পড়েছিলেন। আর বাকি সারা জীবনই মাঠে পড়েছেন। রসুল (স.) ইরশাদ করেছেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করো। (বুখারি শরিফ)

হজরত আনাস (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুল (স.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না। (বুখারি শরিফ)। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

(র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুল (স.) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যেতেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। যার আগে বা পরে আর কোনো নামাজ পড়েননি। তিনি আরো বলেন, রসুল (স.) এক পথে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য পথে ঈদগাহ হতে বাড়ি ফিরতেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল (স.) দুই ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং তাঁহার কন্যা ও স্ত্রীগণকে ও বের হতে নির্দেশ দিতেন। হজরত আয়শা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো মহিলারা কি ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহে যাবে? তিনি বললেন হ্যাঁ অবশ্যই। জিজ্ঞাসা করা হলো 'যুবতি মেয়েরাও কি বের হবে।' তিনি বললেন হ্যাঁ। রসুল (স.) আরো বলেন নিজের কাপড় না থাকলেও কোনো সঙ্গীর কাপড় পড়ে ঈদগাহে যাবে। (তিবরানি)

হজরত উম্মে আতিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল (স.) আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে অন্তঃপুরবাসিনী ও হায়েজ সম্পন্ন মহিলাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসনাতে আহম্মদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল (স.) একবার ঈদের দুই রাকাত সালাত আদায় করেন এবং এর আগে পরে আর কোনো সালাত আদায় করেননি। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসেন এবং তাদেরকে সদকা করার নির্দেশ দেন। তখন উপস্থিত মহিলারা নিজেদের কানের দুল, নাকের বালা ইত্যাদি দান করল, সঙ্গে হজরত বিলাল (র.) ও উপস্থিত ছিলেন। (বুখারি শরিফ)

ইজমা : উল্লিখিত হাদিস ও রসুল (স.)-এর সুন্নাহর ওপরে সকল আলেম ওলামা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে বিনা ওজরে ঈদের সালাত মসজিদে পড়া মাকরুহ। ঈদের মাঠ থাকা অবস্থায় ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা যাবে না।

আমাদের করণীয় : উপরিউক্ত হাদিসে কারিমাহ ও মাসআলার কিতাব হতে এটা পরিষ্কার যে, ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়া সুন্নত। কোনো ওজর ব্যতীত মসজিদে ঈদের নামাজ পড়া মাকরুহ।

হজরত বকর ইবনে মোবাশ্বের আল আনসারি (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিন আমরা রসুল (স.)-এর সঙ্গে ঈদগাহে যেতাম এবং রসুল (স.)-এর সঙ্গে নামাজ আদায় করে বাড়ি ফিরতাম। আবু দাউদ, পৃষ্ঠা ১৬৪।

সর্বোপরি পবিত্র কোরআনে সুরা হাশরের ৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– তোমাদের জন্য রসুল (স.) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো। আরো ইরশাদ হচ্ছে 'হে নবি, আপনি বলুন তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ করো, তাহলেই তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাবে, আর তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১)

ঈদ মুসলমানদের বড় উৎসব। যেখানে সকলে মিলেমিশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ধনী গরীব, সাদা-কালো, ছোট-বড়, রাজা-প্রজা এক সারিতে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর নামের জিকির উচ্চস্বরে বলবে এবং তাকেই সেজদা করবে। মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন পথ চলবে, ভুলে যাবে সকল হিংসা-বিদ্বেষ, এটাই ঈদের মূল শিক্ষা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলমানরা আজ সেই শিক্ষা হতে অনেক দূরে, এবং এর ফল তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে।

তাই ঈদের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর প্রেরণা নিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করা সময়ের দাবি, আল্লাহর নির্দেশ, রাসুলের আদর্শ। তাই আসুন, ঈদের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে দিনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

লেখক : ইসলামি চিন্তাবিদ ও লেখক

নীলদর্পণ এবং তৎকালীন জাতীয়তাবাদী গণজাগরণ

ইকবাল খোরশেদ

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে পলাশীর যুদ্ধে মির জাফর, রায় দুর্লভ, ঘসেটি বেগমদের ষড়যন্ত্রের ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার (১৭৩৩–১৭৫৭) পতন হলে বাংলায় 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' শাসনের সূচনা হয়। এর ফলে বাংলায় আগে থেকে অবস্থানরত ফরাসি ও পর্তুগিজ বণিকদের পাশাপাশি ইংরেজ বণিকরাও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। কাপড়ে রং কারার জন্য বিশ্বে, বিশেষত ইউরোপে নীলের প্রচুর চাহিদা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের সুযোগে ইংরেজ বণিকরা বাংলার কৃষকদের জোরপূর্বক নীল চাষ করতে বাধ্য করে।

উনিশ শতকে নীলকর সাহেবরা বাংলার কৃষকদের জন্য ভয়ংকর অত্যাচারী হয়ে ওঠে। তারা বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। স্থানীয় জমিদার-তালুকদারদের চেয়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি শতগুণ বেশি ছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদাররাও তাদের অধীন নীলকর সাহেবদের যথেষ্ট সমীহ ও ভয় করে চলতেন।

কে প্রথম নীল চাষ করতে শুরু করে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ল্যুই বোনার্ড নামে এক ব্যক্তি মরিশাসে নীল চাষে ব্যর্থ হয়ে বাংলায় আসে। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে সে চন্দননগরের (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার একটি শহর, কলকাতা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে) কাছে গোঁদলপাড়া গ্রামে একটি ছোটো 'নীলকুঠি' স্থাপন করে। এটাই বাংলার প্রথম নীলকুঠি। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বোনার্ড চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝামাঝি

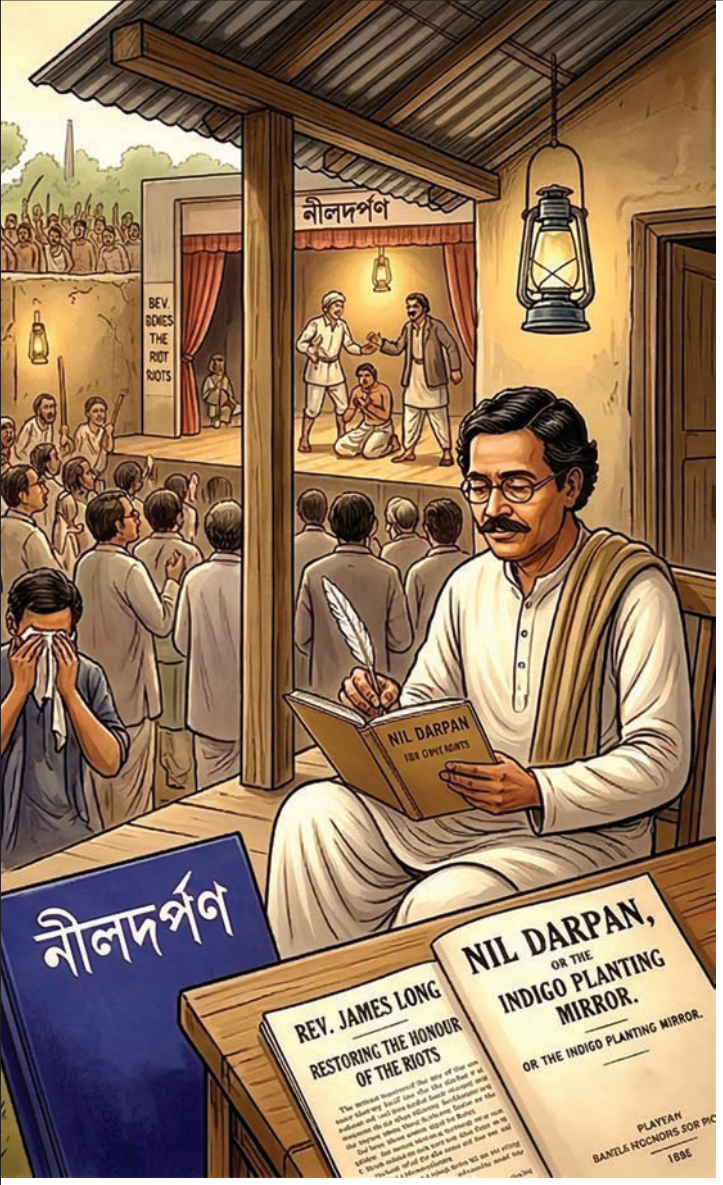

একটি জায়গায় আরো একটি নীলকুঠি স্থাপন করে। এরপর সারা বাংলায় একের পর এক গড়ে ওঠে বহু নীলকুঠি।

১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে ১২০০-১৩০০ মন নীল রপ্তানি হয়। ১৭৯৬ থেকে ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে ৬২ হাজার মন নীল উৎপন্ন হয়। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ৮৫ হাজার ৪০৮ মন নীল কলকাতা থেকে লন্ডনে চালান হয়। বাংলায় নীল চাষের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী উভয়েই মূলধন বিনিয়োগ করে। বাংলা থেকে ১৫০/২০০ টাকা মণদরে নীল কিনে তারা তিন-চার গুণ বেশি মূল্যে লন্ডনের বাজারে বিক্রি করে। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার আইন পাশ করলে নীলকররা আরো শক্তিশালী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

নীল চাষ, নীল প্রক্রিয়াকরণ এবং এ-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের জন্য বড় ভূমিকা পালন করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এগুলোকে বলা হয় 'কনসার্ন'। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলায় প্রায় ৫০০ নীলকর ১৩৪টি কনসার্নে কাজ করে। 'বেঙ্গল ইন্ডিয়া কোম্পানি' ছিল সবচেয়ে বড় কনসার্ন। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বারাসাতে এ কোম্পানির অনেক কনসার্ন ছিল। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রথম নীল চাষ শুরু হয়। ঢাকার নীলক্ষেত এলাকায় বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে নীলের চাষ হতো। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কেবল ঢাকাতেই ৩৭টি নীলকুঠি গড়ে ওঠে। ঢাকায় নীলের একচেটিয়া ব্যবসা করে স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডি থেকে আসা ওয়াইজ পরিবার। এই পরিবারের দ্বিতীয় সদস্য জোসিয়া প্যাট্রিক ওয়াইজের নীল প্রক্রিয়াকরণের সবচেয়ে বড় কারখানা গড়ে ওঠে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। সদরঘাটের কাছে 'ওয়াইজ ঘাট' এখনো সেই স্মৃতি বহন করছে। নীল প্রক্রিয়াকরণের জন্য যারা নীলকুঠিতে চাকরি করতেন তাদের বেশির ভাগই ছিলেন দেশীয় কর্মচারী। নীলকুঠির নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে পেশাদার লাঠিয়ালদের দল।

নীল চাষের জন্য কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার কৃষক ক্রমান্বয়ে অধিক থেকে অধিকতর নিষ্পেষিত হতে থাকে। চুক্তিতে আবদ্ধ করে কৃষকদের জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করে তারা। চুক্তি অনুযায়ী কৃষকদের দাদন অর্থাৎ কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। চুক্তিপত্রে উৎপন্ন নীলের মূল্য কৃষকরা কী হারে পাবেন তারও কোনো উল্লেখ থাকে না। দাদনের চুক্তির সব শর্তই ছিল কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থি। নীলকর সাহেবরা পাইক-বরকন্দাজদের সহায়তায় কৃষকদের জোর করে তাদের শর্ত মেনে নীল চাষ করতে বাধ্য করে। সে-কালের হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ক্যালকাটা রিভিউ, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সমাচার দর্পণ, সোম প্রকাশ, ঢাকা প্রকাশ, সমাচার চন্দ্রিকা, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা প্রভৃতি পত্রিকা নীল চাষের বাস্তবচিত্র এবং কৃষকদের সমর্থনে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মে সমাচার চন্দ্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সমাচার দর্পণ পত্রিকা মন্তব্য করে, "যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি নীলকরেরা ক্রোধ করিয়া থাকেন।...নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই, যেহেতু হিসাব রফা হয় না। প্রতি সনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হাল বকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়।" (সমাচার দর্পণ, ১০ই মে ১৮২২ খ্রি.)।

কীভাবে কৃষকদের জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করা হয়, সে বিষয়েও সমাচার দর্পণ পত্রিকা থেকে জানা যায় : "মফস্বলে কোন কোন নীলকর প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রজা নীলের দাদন না লয়।...খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গোরু নীলের নিকট আইলে সে গোরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্ঠাতে নীলের জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গোরু নীলের নিকটে আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনই সে গোরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে। সে গোরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়।" (সমাচার দর্পণ, ১০ই মে ১৮২২)।

দুই.

বণিক ইংরেজদের এমন দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের ফলে দেশের কৃষককুল একসময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নীলকরদের চরম অত্যাচারের ফলেই ১৮৫৯-'৬০ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক 'নীলবিদ্রোহ' সংগঠিত হয়। পুরো বাংলায় নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে কৃষকরা ফুঁসে ওঠে। তাঁদের মনে দানা বাঁধে এক দৃঢ় সংকল্প, তারা নীল চাষ করবে না। একপর্যায়ে কৃষকদের বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

নীলকররা সেই সময়ে বাংলার ছোটো লাটের কাছে এক স্মারকপত্রে জানায় যে, কৃষকদের দিয়ে কিছুতেই নীলের চাষ করানো সম্ভব হচ্ছে না। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকাসূত্রে জানা যায়, বাংলার কৃষকরা জেগে উঠেছে, তারা প্রতিজ্ঞা করেছে আর নীল চাষ করবে না। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে একজন জর্মন পাদরি এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠি থেকেও বিদ্রোহের বিবরণ পাওয়া যায়। চিঠির ভাষ্যমতে, কৃষকরা কয়েকটি বাহিনীতে বিন্যস্ত হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নীলকরদের লাঠিয়ালরা এদের ভয়ে এতই ভীত যে, কোনোরকম আক্রমণ করতে সাহস পায় না।

তিন.

'নীলবিদ্রোহ' চলাকালেই দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন নীলদর্পণ নাটক। নাটকের কাহিনি এগিয়ে চলে এভাবে:

স্বরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন গৃহস্থ গোলকচন্দ্র বসু, স্ত্রী সাবিত্রী, দুই পুত্র নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব এবং দুই পুত্রবধূ সৈরিন্ধ্রী ও সরলতাকে নিয়ে তার সুখের সংসার। নবীনমাধব উদারচেতা ও হৃদয়বান পুরুষ; বাড়িতে থেকেই বিষয়কর্মের দেখাশোনা করেন। তার ছোটো ভাই বিন্দুমাধব কলকাতায় কলেজে পড়ে। কিন্তু বাংলার অন্যান্য অবস্থাপন্ন কৃষকপরিবারের মতো গোলকচন্দ্র বসুর পরিবারও নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত। নীলকরদের নির্দেশে গত বছর গোলক পঞ্চাশ বিঘা জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য হয়। নীলকররা গত বছরের পাওনা টাকা শোধ না-করেই চলতি বছর ষাট বিঘা জমিতে নীল চাষ করার হুকুম দেয়। শুধু তা-ই নয়, যে পুকুরে বাড়ির মেয়েরা স্নান করে, সে পুকুরের পাড়েও নীলচাষ করার নির্দেশ আসে। গোলকচন্দ্রের প্রতিবেশী সাধুচরণের একটি সংলাপ থেকে নীলকরদের নিপীড়নের ফলে বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় :

"...আপনার বাগান গিয়াছে, গ্যাঁতিও যায়-যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গ্যাঁখান ছারখার কর্য়ে তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ির দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কী ছিল কী হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু বেলায় ৬০খান পাত পড়ত, ১০খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০/৫০টা হবে।...গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজ সেজ দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কী মারটিই মেরেছিল; উহাদের খালাস কর্য়ে আনতে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রি হয়ে যায়। ওই চোটেই দুই মোড়ল গাঁ-ছাড়া হয়।"

স্ত্রী রেবতী, কন্যা ক্ষেত্রমণি আর ভাই রাইচরণকে নিয়ে গোলকচন্দ্র বসুর প্রতিবেশী সাধুচরণের সংসার। সাধুচরণের ভাই রাইচরণ যে জমিটুকুতে ধানের চাষ করে, নীলকুঠির আমিন নিজে এসে সেই উৎকৃষ্ট জমিতে নতুন করে দাগ দিয়ে নীল চাষ করার হুকুম দেয়। রাইচরণ এ নিয়ে আপত্তি করে এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা বলে, এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কুঠির লোকেরা কিছুক্ষণ পরে এসে দুভাইকে ধরে নিয়ে যায়। সাধুচরণ যত নিজের সমস্যা বোঝাতে চায়, নীলকর আই আই উড কোনোমতেই তা বুঝতে চায় না। সাধুচরণ বলে, নীলকরদের সাথে তার বিরোধ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনোটাই নেই। কিন্তু ধান চাষ না-করে শুধু নীল চাষ করলে তাদের না-খেয়ে মরতে হবে। বাঙালি দেওয়ান উডকে উস্‌কে দেয় সাধুচরণের বিরুদ্ধে এবং আমিন বলে, বেটা সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে চায়। সাধুর কোনো কথা উড শোনে না। নীলকুঠিতে অভুক্ত রাইচরণকে উড নিজ হাতে চাবুক মারে। রাইচরণ ক্রোধের সঙ্গে ভাইকে বলে, "ও দাদা, তুই চুপ দে, যা ন্যাকে নিতে চায় ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ি ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যালো, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না"। নবীনমাধব খবর পেয়ে সাধুচরণ-রাইচরণের হয়ে উড সাহেবকে অনুনয় করতে আসে। সাহেব নবীনকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলে এবং সাধুচরণকেও চাবুক মারতে শুরু করে। উড নবীনকেও গালাগাল করতে ছাড়ে না। দেওয়ান নবীনকে মানসম্মান নিয়ে চলে যেতে বলে। নবীন বাধ্য হয়ে ফিরে আসে। উড দুভাইকে দিয়ে যা খুশি লিখিয়ে নেয়।

গোলকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনমাধব, সে নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলা করতে চায় কিন্তু নির্বিরোধ এবং নীলকরদের ভয়ে ভীত পিতার জন্য করতে পারে না। নীলকুঠির দেওয়ান গোপীনাথ নীলকরদের কানে মন্ত্রণা দেয় যে, নবীন নীলকুঠির প্রধান শত্রু। কারণ, সে নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের দরখাস্ত লিখে দেয়, মোক্তারদের এমন পরামর্শ দেয় যেন, হাকিমের রায় কৃষকদের পক্ষে যায়। নবীন কৃষকদের রক্ষক হয়েছে। নীলকররা তাই নবীনকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার পিতা গোলকচন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঠুকে দেয়। নীলকররা স্থানীয় কৃষকদের কুঠিরে ধরে এনেছে গোলকচন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে। তোরাপ (মুসলিম রায়ত) সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় না। অন্য একজন কৃষক জানায়, সাহেবদের লাথি আর চাবুকের বাড়ি খেয়ে সে সাক্ষী দিতে রাজি হয়। নইলে গোলকচন্দ্রের নুন তো সেও খেয়েছে কিন্তু সাহেবেদের নির্যাতনের ভয়ে সাক্ষী না-দিয়ে উপায় কী? তোরাপ বলে, সে জীবন গেলেও গোলকচন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না। সামান্য পরেই চাবুক হাতে বের হয়ে আসে নীলকর পি. পি. রোগ। তোরাপ মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি নয় জেনে রোগ তাকে চাবুক মারতে থাকে। তোরাপ মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য চালাকি করে সাক্ষী দিতে রাজি হয়, পরে নীলকুঠির বন্দিদশা থেকে পালিয়ে আসে।

নীলকর সাহেবরা কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করেই ক্ষান্ত হতো না। কৃষকদের ঘরের বউ-ঝিকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক নির্যাতন করত। সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে ধরে নিয়ে যায় নীলকর পি. পি. রোগ। তাদের কথোপকথন এমন :

ক্ষেত্র : ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ি পেটয় দাও, আঁদার রাত মুই একা যাতি পারবো না–(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও...

রোগ : তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোনো কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইসো, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিবো।

নীলদর্পণ নাটকের কোনো ঘটনা বা চরিত্র দীনবন্ধু মিত্রের কল্পনাপ্রসূত নয়, বাস্তব; শুধু গল্প বিন্যাসের আঙ্গিক তাঁর নিজস্ব।

মফস্বলে কোন কোন নীলকর প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রজা নীলের দাদন না লয়।...খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গোরু নীলের নিকট আইলে সে গোরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্ঠাতে নীলের জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গোরু নীলের নিকটে আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনই সে গোরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে। সে গোরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়

স্বরপুর গ্রামের গোলকচন্দ্র বসুর পরিবার (গোয়াতেলিয়ার মিত্র-পরিবার); নবীনমাধব, বিন্দুমাধব (চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বাঁশবেড়িয়ার বিশ্বনাথ); গোপী নাথ (ঝিনাইদহের নীলকর দেওয়ান মহেশ চট্টোপাধ্যায়); সাধুচরণ, রাইচরণ, তোরাপ ও অন্যান্য রায়ত (নদীয়া যশোরের জমির মণ্ডল, হাজিমোল্লা, পাঞ্জুমোল্লা প্রমুখ কৃষক); বেগুনবেড়ে কুঠির নীলকর আই. আই. উড ও পি. পি. রোগ (মোল্লাহাটি নীলকুঠির নীলকর লারমুর আর্চিবল্ড হিলস্ ফারলং); চতুর্থ অঙ্ক/তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ইন্দ্রাবাদ জেলখানা দৃশ্যে উল্লিখিত পাদরি (পাদরি ডাফ ও পাদরি বমভাইটস); জেল দারোগা (যশোরের পুলিশ ইন্সপেক্টর গিরিশচন্দ্র বসু); পি. পি. রোগ কর্তৃক ক্ষেত্রমণির অপহরণ (আর্চিবল্ড হিলস্ কর্তৃক নদীয়ার মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ হরমণির অপরহরণ, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯)।

চার.

নীলদর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকায় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। বইয়ের প্রচ্ছদে নাটকের পুরো নাম– 'নীল দর্পণং নাটকং'। সরকারি চাকুরে দীনবন্ধু মিত্র নাটকের রচয়িতা হিসেবে নিজের নাম প্রকাশ করার সাহস পাননি। 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। মুদ্রাকরের স্থানে ছাপানো হয় 'শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাটকটি এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, একবছরের মধ্যেই দ্বিতীয় মুদ্রণ করতে হয়। বাংলা ভাষায় রচিত 'নীলদর্পণ' বাঙালিদের মাঝে বিপুল সাড়া ফেললেও ইংরেজদের কাছে তা পৌঁছাতে পারেনি। দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠ পাদরি রেভারেন্ড জেমস লংয়ের অনুরোধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ করেন। পাদরি লং কলকাতার কাশীটোলার 'প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং প্রেস' থেকে ইংরেজি নীলদর্পণ ছেপে বের করেন। নাটকটি Nil Darpan, The Indigo Planting Mirror নামে ছাপানো হয় অনুবাদকের নাম ছাড়া; শুধু লেখা হয় Translated from the Bengali by a Native।

ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের পর কলকাতার ব্রিটিশ প্রেস আর নীলকরদের সংগঠন 'ল্যান্ডহোল্ডার অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া' ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বইটির মুদ্রাকর সি. এইচ. ম্যানুয়েলের নামে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিচারের সময়ে ম্যানুয়েল আদালতে বলেন যে, গ্রন্থটির প্রকাশক রেভারেন্ড জেমস লং। ম্যানুয়েলকে এই পরামর্শ দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠ পাদরি জেমস লংই দিয়েছিলেন। আদালত ম্যানুয়েলকে দশ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেয়। ম্যানুয়েল ছাড়া পায়। তবে, মামলা শুরু হয় জেমস লংয়ের বিরুদ্ধে। মামলার প্রধান বিচারক মরড্যান্ট ওয়েলস। লংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, ইংরেজি নীলদর্পণ প্রকাশ করে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছেন। মামলার জেরা, সাক্ষ্য থেকে ইংরেজি নীলদর্পণ মুদ্রণ ও প্রচারের পেছনে বাংলার সেক্রেটারি ডব্লিউ. এস. সিটনকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উঠে আসে। বইখানা ছাপানো হয় সম্পূর্ণভাবে বাংলা সরকারের টাকায় এবং ছাপা হওয়ার পর সেগুলো সিটনকারের বাড়ি থেকে সরকারি খামে, সরকারি ডাকখরচে ভারতের ও লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের কাছে দুই শতাধিক কপি পাঠানো হয়। কিন্তু এর জন্য সিটনকারকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়নি।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই জেমস লংয়ের বিচার কাজ শুরু হয়। সাক্ষ্যপ্রদানকালে আদালত-প্রাঙ্গণ ব্রিটিশ কর্মকর্তা, নীলকর সাহেব, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও জমিদারদের উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে। নীলকর ও ইংরেজ নারীদের অন্যায়ভাবে কলঙ্কিত করার অপরাধে প্রহসনমূলক বিচারে জেমস লংকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২৪শে জুলাই রায় দেন বিচারপতি মরড্যান্ট ওয়েলস। রায়ে তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অদালতে উপস্থিত কালীপ্রসন্ন সিংহ সঙ্গে সঙ্গে এই জরিমানার টাকা পরিশোধ করে দেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ লণ্ডের কৌসুলির ব্যয় বহন করেন।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের পরের বছরই সবার আগে ঢাকায় মঞ্চস্থ হয়। পরের দুই বছর বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে ঢাকার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় পুনঃপুন নাটকটি অভিনীত হতে থাকে। ঢাকার রঙ্গমঞ্চে বারবার অভিনীত হওয়ায় নীলকরদের অসহনীয় অত্যাচার, নির্যাতন ও দৌরাত্ম্য সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি সচেতন হয়ে ওঠে। মঞ্চায়নের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জাগরণের ঢেউ দেশ জুড়ে বিস্তার লাভ করে।

ঢাকায় প্রদর্শনের প্রায় ১১ বছর পর নীলদর্পণ নাটক কলকাতায় প্রথম মঞ্চস্থ করে 'ন্যাশনাল থিয়েটার', ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে। দর্শনীর বিনিময় হার রাখা হয় এক টাকা এবং আট আনা। নীলদর্পণ নাটক

মঞ্চায়নের সঙ্গে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত– নাটকে নীলকর পি. পি. রোগের ভূমিকায় অভিনয় করেন শক্তিমান অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। ক্ষেত্রমণির ওপর পাশবিক নির্যাতনের অভিনয় দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এতই খেপে যান যে, পায়ের জুতা খুলে ছুড়ে মারেন অর্ধেন্দুর গায়ে। তিনিও তাঁর অভিনয়ের পুরস্কার মান্য করে সেই জুতা তুলে নেন স্মারক হিসেবে। তবে, এই জনশ্রুতির কোনো দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। নীলদর্পণের দুই ইংরেজ নীলকর আই. আই. উড এবং পি. পি. রোগ-এর চরিত্র বাংলার নাট্যশালায় বুর্জোয়া সমাজের, সাম্রাজ্যবাদের প্রথম প্রতিনিধি। দীনবন্ধু তাদের দানবীয় চেহারাই উপস্থাপন করেছেন।

পাঁচ.

নীলদর্পণ প্রকাশের পূর্বেই ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ ইংরেজ সরকার নীল উৎপাদন-ব্যবস্থা ও এর অর্থনীতি তদন্ত করার জন্য 'নীল কমিশন' (Indigo Commission) গঠন করে। বাংলার সেক্রেটারি ডব্লিউ. এস. সিটনকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এর অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন আর টেম্পল (সরকারি প্রতিনিধি), রেভারেন্ড জে. সেল (খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রতিনিধি), ডব্লিউ. এফ. ফারগুসন (নীলকরদের প্রতিনিধি) ও চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি (জমিদারদের প্রতিনিধি)। ১৫ জন সরকারি চাকুরে, ২১ জন নীলকর, ৮ জন খ্রিষ্টান মিশনারি, ১৩ জন জমিদার ও ৭৭ জন রায়ত মিলে মোট ১৩৪ জন কমিশনের সামনে তাদের জবানবন্দি দেন। ওই বছরেরই ১৮ই মে থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত সাক্ষ্যদান চলে। কমিশন নীলকরদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের বেশির ভাগই স্বীকার করে নেয় এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয় যে, 'নীলকরদিগের ব্যবসা-পদ্ধতি উদ্দেশ্যত পাপজনক, কার্যত ক্ষতিকারক এবং মূলত ভ্রমসঙ্কুল'। প্রতিবেদন সম্পর্কে বাংলার ছোট লাট ল্যাফটেনেন্টে গর্ভনর অব বেঙ্গল স্যার জন পিটার গ্রান্ট সাহেব মন্তব্য করেন যে, 'বাংলার প্রজা ক্রীতদাস নহে, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী। নিজেদের ক্ষতি হয় এমন কিছুর বিপক্ষে দাঁড়ানো তাদের জন্য বিস্ময়কর নহে। যা ক্ষতিজনক তা করাতে গেলে অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী, এই অত্যাচারের আতিশয্যই নীল বপনে প্রজার আপত্তির মূল কারণ।'

নীল কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পর এই আইন বিধিবদ্ধ করা হয় যে, 'কোনো নীলকরই আর প্রজা-রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কৃষকদের দ্বারা নীলের চাষ করাতে পারবে না। নীলের চাষ করা সম্পূর্ণ কৃষকদের ইচ্ছাধীন।' সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সরকার নীল চাষের পক্ষে বা বিরুদ্ধে নয়। অন্য শস্যের মতো নীল চাষ করা-না-করা সম্পূর্ণরূপে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার।

তবে, নীলদর্পণ মামলার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষায় নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। এতে ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী প্রত্রিকাসমূহ বিচারপতি ওয়েলসের তীব্র নিন্দা করে; বাংলা সরকারের সেক্রেটারি ডব্লিউ. এস. সিটনকার ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট পদত্যাগ করেন; নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল বাংলার ছোট লাট ল্যাফটেনেন্টে গর্ভনর অব বেঙ্গল স্যার জন পিটার গ্রান্ট পদত্যাগ করে ভারত ছেড়ে চলে যান। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে অষ্টম আইন দ্বারা 'নীলচুক্তি আইন' বাতিল করতে বাধ্য হন।

এদিকে নীলদর্পণ বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীসমাজেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। রেভারেন্ড জেমস লংয়ের কারাদণ্ড বাঙালি লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভালোভাবে নেয়নি। এই বিচারের রায় নিয়ে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের উদ্যোগে বিচারক ওয়েলসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিচারকের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জন্য এই সভার প্রস্তাবক্রমে বিশ হাজার লোকের স্বাক্ষর সংবলিত এক অভিযোগপত্র বড় লাট লর্ড চালর্স ক্যানিংয়ের কাছে পাঠানো হয়। বিচার চলাকালীন দীনবন্ধু মিত্রও আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তখনো পর্যন্ত নাট্যকার ও অনুবাদকের নাম প্রকাশিত হয়নি।

দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও নীলদর্পণ মামলার রায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশের স্বভাব-কবি ও গায়েনরা ছড়া ও গান বেঁধে গ্রামে-গঞ্জে গাইতে থাকে :

"নীলবানরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মলো লঙের হলো কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার..."

নীলদর্পণ নাটক গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষক ও শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ইন্ডিয়ান ফিল্ড, সোম প্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা 'নীলবিদ্রোহে'র পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে সমর্থন জানায়। কলকাতার বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণি কৃষকদের পক্ষে কাজ করতে শুরু করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, যশোরের নীল-আন্দোলনের নেতা শিশির কুমার ঘোষ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের ব্যারিস্টার মদনমোহন ঘোষের মতো ব্যক্তিরা নীলকরবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কলকাতার রাজনৈতিক নেতারা সরকারের কাছ থেকে সুবিধা লাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া বাণিজ্য ও ইংরেজদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানান। হিন্দু রাজনৈতিক গোষ্ঠী জাতিভেদ প্রথা উপেক্ষা করে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। লংয়ের কারাদণ্ডের ফলে প্রজা-রায়তদের মধ্যে যে-জাগরণের সৃষ্টি হয়, তাতে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণি নিঃস্বার্থ সমর্থন জানায়। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বেগবান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

লেখক : সম্পাদক, আনন্দ ভুবন

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুর

মোখলেছা খাতুন

কি মধুর সুরের ধ্বনিতে ডাকছে তোমায়
সময় হয়েছে ওঠো বাতাস কইছে কানে
যে তোমাকে করেছে সুন্দর সুরতে সৃষ্টি
দিয়েছে জীবনে পথ চলার অন্তর্দৃষ্টি
সময় হয়েছে– মগ্ন হও তারই ধ্যানে।
সারা দিনেরাতে ফুরসৎ হয়নি তাকে ডাকার
যে তোমাকে দিয়েছে এত ঐশ্বর্য্য পৃথিবীতে
বেঁচে থাকার কত শত সুন্দর সম্ভার
মুয়াজ্জিনের আজানের সুর জাগালো তোমায়
জীবনের ভুল ত্রুটি ক্ষমার সুযোগ চাইবার।
তোমার একটি সেজদায় একটি নতজানুতে
তোমার মনের অনুতাপের এক ফোঁটা অশ্রুতে
ঝরে পড়ুক শত পাপের বোঝা জায়নামাজে
বুঝে না বুঝে করছে যত ভূল জীবনে
পরিশুদ্ধ করে নাও নিজেকে স্রষ্টার স্মরণে।
পাপ হোক তা সাগরের সমান
স্বয়ং স্রষ্টা অপেক্ষায় তার বান্দার
শেষ বিচারের দিনে, ভুলের মাসুল না দিলে
কি জবাব দেবে তোমার মহান সৃষ্টিকর্তাকে
পেয়ারা রাসুল ডাকবে হায় উম্মত, হায় উম্মত।

ইতিহাসের পাটাতনে আবুল মনসুর আহমেদ পাঠ

কুদরত-ই-গুল

ব্যক্তি হয়ে জন্মায় না, হয়ে ওঠে। এমন একটা কথা সারা দুনিয়ায় মশহুর। ব্যক্তি তার সময়ের চাপ-তাপ এবং পূর্বের অনড় ইতিহাসের ভেতর দিয়ে নিজেকে চেনে, জানে এবং বোঝে। আর নিজেকে চেনার, জানার এবং বোঝার ভেতর দিয়ে সে নানা প্রশ্ন হাজির করে নিজের মনের মধ্যে। সেই মাফিক কেউ কেউ ভাঙতে চায় অচলায়তন, সত্য-মিথ্যার গোমর করতে চায় ফাঁস, নিরন্তর তোলে প্রশ্ন এবং চায় মীমাংসা। আবুল মনসুর আহমেদ তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি কৃষক ও মুসলমান কৃষক-প্রজার দারিদ্র্য, শোষণ-অপমান এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দু, হিন্দু জমিদার ও ইংরেজদের আধিপত্যের নানা চেহারা দেখেছেন খুব কাছ থেকে। যা তাঁর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক জীবনে কেটে গেছে গভীর দাগ। সব দেখেশুনে নিজস্ব স্বকীয়তায়, নিজেদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের আত্ম-উন্নতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তৃতীয় তীরের একজন অর্গানিক মেধাজীবী হিসেবে।

তাঁর বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত 'ধপরায়ণ'-এর অপসংস্কৃতিকে ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। যার যতটুকু পাওনা তার ন্যায্য-হিস্যা বুঝে পাওয়া এবং দেওয়ার ব্রত নিয়েই কাজ করেছেন সব সময়। ছোটবেলায় স্কুলে বাংলায় মিলাদ পড়ানো, নায়েব বাবুর 'তুই' জবাবে 'তুই' সম্বোধন করা, দাবিদাওয়া আদায়ে সভা করা, এগারো বছর বয়সে প্রজা-সভা করা, সাধারণ প্রজাদের সসম্মানে বৈঠকে আসন দেওয়া, হিন্দু পূজায় মুসলমানদের বাধ্যতামূলক চাঁদা দেয়ার প্রতিবাদ করা, হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের পৃথক বেঞ্চিতে বসতে দেওয়ার প্রতিবাদ করা ইত্যাদি বিষয় তাঁর কাছে স্রেফ নির্যাতন মনে হয়েছে।

এছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চ শ্রেণির হিন্দু, পত্রপত্রিকার কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার দুই-একটি উদাহরণ তাঁর জবানে দেওয়া যেতে পারে। তাঁর স্কুলে জমিদারের ম্যানেজার কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী সভাপতির ভাষণে এক জায়াগায় বলেন, 'ভদ্রলোকদের দেখাদেখি আজকাল মুসলমানরাও বিদ্যাশিক্ষার দিকে মন দিয়াছে দেখিয়া আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি।' তখন তিনি হাই-স্কুলের ছাত্র। তিনি 'ভদ্রলোক' বর্গকে উল্লেখ করে প্রতিবাদ করেন। তার মানে মুসলমান 'ভদ্র' নয়! এছাড়া 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় একটি সভার কথা উল্লেখ করে ছাপা হয় যে, 'সভায় কতিপয় ভদ্রলোক ও অনেক মুসলমান যোগ দিয়াছিলেন।' তার মানে 'মুসলমান' বর্গটিকে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় হোক আর যেকোনোভাবেই হোক 'অপরায়িত' করা হয়েছে। এই যে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদী' উচ্চ বর্ণের বড় মধ্যবিত্ত হিন্দু, হিন্দু জমিদার ও ইংরেজঘেঁষা হিন্দু অভিজাত নিজেদের 'নিজ'(self) আর ওই নিম্নবর্গের হিন্দু কৃষক এবং মুসলমান কৃষকদের একই বর্গে বিবেচনাপূর্বক 'অপরায়ন' (other) করার যে অপরাজনীতি, তাকেই তিনি নস্যাৎ করতে চেয়েছেন আজন্ম। এটা তাঁর লড়ায়ের একটা অন্যতম ক্ষেত্র।

তিনি যখন ধীরে ধীরে 'ধপরায়ণ'-এর রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করছেন, তখন উপলব্ধি করেন হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা যতটা না

ধর্মীয় তার চেয়ে অধিকাংশই অর্থনৈতিক। তিনি শেরেবাংলাকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'বাংলার অর্থনীতিই বাংলার আসল রাজনীতি।' তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বাংলার গোটা মুসলমান সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়। অর্থনীতিতে মুসলমানদের এই অধঃপতন জীবনের সকল স্তরে সুস্পষ্ট দৃশ্যমান দুইটা পৃথক জাতি হইয়া গেল।' তিনি একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন চরম সমালোচনামুখর। তিনি বন্ধুদের প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'উকিল হিন্দু মক্কেল মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান, জেইলার হিন্দু কয়েদি মুসলমান ইত্যাদি ইত্যাদি।'

১৯৩৩-৩৪ সালে ময়মনসিংহে বন্যার্তদের জন্য বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়। বেশ টাকা চাঁদা হিসাবে ওঠে। চাঁদা বণ্টনের এক পর্যায়ে সমিতির প্রেসিডেন্ট স্মরণ করিয়ে দেন, চাঁদাদাতার সিংহভাগই হিন্দু। আবুল মনসুর আহমেদ গর্জে উঠে অনেক কথার পরে বলেন, 'অতএব বাংলার দাতা হিন্দু, ভিক্ষুক মুসলমান!' তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম বাংলার হিন্দুদের ঘরে যত টাকা আছে সব টাকা মুসলমানের! মুসলমান চাষি-মজুরের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া-রোজগার করা টাকায় হিন্দুরা সিন্দুক ভরিয়াছে, দালান-ইমারত গড়িয়াছে, গাড়ি-ঘোড়া দৌড়াইতেছে।' উত্তেজনার বসে তিনি তাৎক্ষণিক রায় বাহাদুরের ব্যাংকেও মুসলমানের টাকা আছে বলে উল্লেখ করেন। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে উত্তেজনার বসে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মনে হলেও এর ঐতিহাসিক বাস্তবতায় অর্থনৈতিক নিপীড়নের শেকড় ছিল অনেক গভীরে। নানা কারণের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে 'অপরায়িত' করার কারণে রাজনৈতিক দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যা আবুল মনসুর আহমদ টের পেয়েছিলেন হাড়ে হাড়ে। এই অর্থনৈতিক অধঃপতন, শোষণই মুসলমানদের আলাদা সত্তা হিসাবে ভাবতে অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে।

এছাড়া ভারতীয় জাতীয়তা এবং বাঙালি জাতীয়তার রাজনীতির দৃশ্যমান এক রূপরেখা আবুল মনসুর আহমেদ তুলে ধরেছেন খুবই তীব্র দৃষ্টিতে। রাজনীতিতে ব্যতিক্রমহীনভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শরৎ বসুদের মতো কয়েক জন অসাম্প্রদায়িক নেতা ছাড়া হিন্দু নেতাদের মনোভঙ্গি ছিল এমন যে, তাঁরা (হিন্দু নেতা) বুঝতেন মাইনরিটি মুসলমান সমাজ বিপুল বেগবান হিন্দু সম্প্রদায়ে লীন হবে। যেমন, ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল মহাসাগরে লীন হয়। এটাকে তাঁরা অন্যায় বা অসম্ভব মনে করতেন না। তিনি বলেন, "হাজার বছর মুসলমানরা হিন্দুর সাথে এদেশে একত্রে বাস করিয়াছে। হিন্দুদের রাজা হিসাবেও, মুসলমানদের প্রজা হিসাবেও। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এইজন্য যে, হিন্দুরা চাহিত 'আর্য্য-অনার্য্য শক-হুন' যেভাবে মহাভারতের সাগর তীরে 'লীন' হইয়াছিল, মুসলমানরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাউক। তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, 'হিন্দু-মুসলমান' হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দু-সভার জনতার মত ছিল না, বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল।" এই ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদের পার্থক্য তুলে ধরে তিনি এভাবে নির্মোহ সমালোচনা করেছেন। বলা দরকার, এই বৈষম্যের পেছনে 'জাতীয়তাবাদ'-এর রাজনীতিও ছিল ব্যাপকভাকে তাজা এবং সক্রিয়।

তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে বলতে চান, বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে যতই ঝুঁকেছে, বাংলার কৃষক ও মুসলমান কৃষকের স্বকীয়তা নানা আন্দোলনে স্পষ্ট হয়েছে। দেখা যায় যতই তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া উঠিয়েছে, তা কোনোক্রমেই ধোপে না টেকে বরং উলটো সে ধোঁয়া তাদের চোখে-মুখে লেগেছে। ফলে তার পরিণতি আমরা দেশভাগের ভেতর দিয়ে দেখতে পাই। অতি আধিপত্যবাদী জাতীয়তাবাদ যে ভাঙন ডেকে আনতে পারে তা তিনি বিশেষভাবে টের পেয়েছিলেন।

তবে আবুল মনসুর আহমেদ মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে যে সাম্প্রদায়িক ছিলেন, তা কিন্তু নয়। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান গণতান্ত্রিক সেক্যুলার মুসলমান। তিনি কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগের দিকে ঝুঁকে পড়েন। কংগ্রেস যখন অতিরিক্ত হিন্দুরূপী হয়ে উঠছিল, তিনি অনুভব করেন তাঁর যে নিজস্ব চিন্তার স্বকীয়তা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুসলিম ভিত্তিতে ঝুঁকে পড়ছে। তিনি মূলত 'মুসলিম' বর্গ বলতে ধর্মীয় সরলতা বোঝান না, তিনি যে মুসলমান তার স্বকীয়তা এবং আত্মমর্যাদার কথাকে স্মরণ করিয়ে দেন। কারণ তিনি যে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বকীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কোনো ধর্মান্ধতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলছেন, 'বন্ধুরা বলতেন, তুমি নাস্তিক হলে নাস্তিক তবে মুসলিম নাস্তিক, তুমি কমিউনিস্ট হলে মুসলিম কমিউনিস্ট। বস্তুত চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের টান আমার ভিতর গভীরভাবে কাজ করিত। আমি বুঝিলাম বাঙালি রাজনীতি মুসলিম স্বার্থ, কৃষক লড়াই এসব আলাদা না, তারা জটিলভাবে একে অপরের সাথে মিশিয়া আছে।' তার মানে একদিকে নিষ্ঠাবান সেক্যুলার মুসলমান ও দরিদ্র কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা এবং হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য এই পলিবিধৌত বদ্বীপের স্বাধিকারের দিকে তিনি মনোনিবেশ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে এখানেই তাঁর পক্ষপাত।

তবে তিনি অন্ধের মতো পাকিস্তানের পক্ষপাতিত্ব করেননি। তিনি পাকিস্তানবাদী হলেন, কিন্তু তা ছিল খুবই গণতান্ত্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাপ্রসূত। তিনি পাকিস্তানবাদী হওয়ার পেছনে দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিচার্য বলে মনে করেছিলেন। এক, 'পাকিস্তান দাবিকে দেশ-বিদেশের সকল চিন্তকের কাছে গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে উহাকে একটা ইনটেলেকচুয়াল রূপ দিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে উহাকে যুক্তিসহ ও প্র্যাকটিক্যাল করিতে হইবে।' দুই, 'শুধু ধর্মের ডাকে পাকিস্তান আসিলে মোল্লাদের প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোল্লাদের প্রভাবে মুসলমানরা কেবল পিছন ফিরিয়া রাস্তা চলে। তাই জীবন-পথে মুসলমানরা এত বেশি হোঁচট খাইতেছে। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের নামে রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাতে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। এই দুইটা সম্ভাবনাকে ঠেকাইতে হইবে।' এই দুইটা ছোট বয়ানের ভেতর পাকিস্তান টিকবে কি টিকবে না তার এক মহাবয়ান হাজির আছে।

তিনি রেনেসাঁ সোসাইটির আয়োজনে ইসলামিয়া কলেজের মিলনায়তনে ১৯৪৪ সালের ৫ মে তারিখে সভাপতির ভাষণে পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে কালচারাল অটোনমির দাবি তোলেন, যা ওই সময় উপস্থিত ডাকসাইটে নেতাকর্মীদের ব্যাপকভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। তিনি বলেন, পাকিস্তান দাবিটা প্রধানত কালচারেল অটনমির দাবি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও কালচারেল অটনমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক হইতে পাকিস্তান দাবি শুধু

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি নয়। এটা গোটা ভারতের মাইনরিটির জাতীয় দাবি। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দু হইতে আলাদা জাত তো বটেই; বাংলার মুসলমানরাও পশ্চিমা মুসলমানদের হইতে পৃথক জাত। শুধুমাত্র ধর্ম জাতীয়তার বুনিয়াদ হইতে পারে না।' তিনি যে তাত্ত্বিক চেতনার ওপর ভর করে সুদূরপ্রসারী কথাগুলো বলেছিলেন, তা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে দৈব বাণীর মতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি অবশেষে জিন্নাহর ওপর আস্থা রেখেই পাকিস্তান আন্দোলনে শামিল হন। কেননা তিনি জিন্নাহকে প্রগতিবাদী মডার্ন নেতা হিসাবেই জানতেন। তাতে তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং আশ্বস্ত হন, সেখানে কোনোক্রমে মোল্লাদের দৌরাত্ম্য থাকবে না। তখন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, মাহমুহদাবাদের তরুণ রাজা বক্তৃতায় মত প্রকাশ করেন, কোরআনের আইন অনুসারে শাসন কাজ চলবে। কিন্তু জিন্নাহ পত্রিকায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এক প্রকার ধমকের সুরে বলেন, 'পাকিস্তান একটি মডার্ন প্রগতিবাদী রাষ্ট্র হবে।'

মূলত আবুল মনসুর আহমদ মনে করতেন, পাকিস্তান সংগ্রামে যদি জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে জমিদার-ধনিকদের প্রাধান্য অঙ্কুরে বিনষ্ট হতে পারে। আর এ অবস্থায় বাংলার কৃষক-প্রজা নেতাকর্মীরা যদি সদলবলে মুসলিম লীগে অংশ নেয়, তাহলে একটা গণতন্ত্রমুখী ইনসাফের পাকিস্তান সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করতেন। যদিও তাঁর স্বপ্নের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আগাম চিন্তায় যা ছিল তা বাস্তবে কোনোক্রমেই শেষ রক্ষার মুখ দেখে নাই। তাই তিনি হতাশ হয়েছিলেন।

মুসলিম লীগের ভেতরে গণতান্ত্রিক কৃষক-প্রজা মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা বালির বাঁধের মতো গুমরে গুমরে ধসে গেল। তিনি দেখলেন মুসলিম লীগ কেবলই একটা 'পকেট লীগে' পরিণত হয়েছে। এসব দেখে-শুনে খেপে গিয়ে তিনি অবশেষে যোগ দেন আওয়ামী মুসলিম লীগে। সেখানে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ২১ দফা ইশতেহার তিনি তৈরি করেন। এবং নানা সময়ে ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে থেকে প্রকারান্তরে স্বায়ত্তশাসনের কথা প্রকাশ করতে থাকেন নানাভাবে। তিনি ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেন, যা ঐতিহাসিক ছয় দফার সঙ্গে প্রায় মিল খায়। তিনি যেভাবে বলেছেন– ১. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত হইতে হইবে। ২. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আসলে দুটি দেশ। ৩. উহাদের বাসিন্দারা আসলে দুইটি জাতি। ৪. দুই পাকিস্তানের আসল সমস্যা রাজনৈতিকের চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক... ৫. পূর্ব বাংলা হইতে যে টাকা পশ্চিমে আসে তা ফিরিয়া যায় না। এটা কার্যত একরোখা অর্থনীতি।...তিনি আরো বলেন, 'মনে রাখিবেন ভূগোল ও ইতিহাস যমজ সহোদর। যদি ভূগোলকে আপনারা অস্বীকার করেন, তবে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করিবে না। মনে রাখিবেন ইতিহাসের পুনরাবর্তন অবশ্যম্ভাবী।' এটা বিস্ময়কর যে, স্বধীনতার ভ্রূণও যেখানে জন্ম নেয় নাই, সেখানে গণপরিষদে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পরিণতি সম্পর্কে যে এক বাস্তবসম্মত ঐতিহাসিক দার্শনিক বক্তব্য রাখলেন তা সত্যই বিরল।

স্বাধীনতার পর সংবিধান প্রণয়নের সময় তিনি গণতন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন এভাবে, 'পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের সময় আমি বলিয়াছিলাম, পাকিস্তানে ইসলাম রক্ষা না করিয়া গণতন্ত্র রক্ষার ব্যবস্থা করুন। গণতন্ত্রই ধর্মের গ্যারান্টি। বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতাদের আমি বলিয়াছিলাম, বাংলাদেশে সমাজবাদের কোন বিপদ নাই; যত বিপদ গণতন্ত্রতে। গণতন্ত্রকে রোগমুক্ত করুন অবশ্যই সমাজবাদ সুস্থ হইয়া যাইবে।' মজার বিষয় হলো তিনি যেন গণিতের সূত্রের মতো রাষ্ট্রীয় সমস্যা চিহ্নিত এবং সমাধান করে দিচ্ছেন। কতটা তাত্ত্বিক, প্রাজ্ঞ, বাস্তবসম্মত ধাতস্থ চিন্তার অধিকারী হলে এমন মতামত দেয়া যায়, তা সত্যই বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তির জগতে বিরলই বটে।

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, তাঁর লেখা 'শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু' বইটা প্রকাশের পর তাঁর ছেলে মাহবুব আনাম বইটা বঙ্গবন্ধুকে উপহার দিতে যান। বঙ্গবন্ধু বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লেখককে তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসেবে অভিহিত করেন। খানিক পর বইটার পাতা উলটিয়ে যখন দেখেন মুহাম্মদ আলি জিন্নাহকে লেখক 'কায়েদে আজম' বলে অভিহিত করেছেন। তখন তিনি বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, মনসুর ভাই জিন্না ব্যাটাকে কায়েদে আযম লিখেছেন? তিনি কি জানেন না যে বাঙালিদের যাবতীয় সর্বনাশের মূলে ঐ জিন্না শয়তানটা।' বঙ্গবন্ধুর ঐ প্রশ্নের উত্তরে আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্য ছিল এমন, 'আবুল মনসুর একজন ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিকের কর্তব্য ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা। তাঁর সাধ্য নেই ইতিহাসের গতি পরিবর্তন, পরিবর্ধনের। জিন্নাহ সাহেবকে তাঁর দেশবাসী ভালবেসে কায়েদে আযম পদবী দিয়েছে। সেটা আবুল মনসুরের মতো ঐতিহাসিকের কলমের এক খোঁচায় শেষ হতে পারে না।...পাকিস্তানী আমলের সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর ভারতীয় নেতা গান্ধীকে চিরকাল আমি মহাত্মাজী বলে অভিহিত করে এসেছি পাকিস্তানী ভ্রূকূটী অগ্রাহ্য করে। সম্মানী লোকের সম্মান দিতে জানাটাও গৌরবের, যে দেয় তার জন্যই যে পায় তার জন্য নয়। তাছাড়া খোদা না খাস্তা এমন দিন যদি বাংলাদেশে কোনদিন আসে যেদিন শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলার কেউ থাকবে না– ঐতিহাসিক আবুল মনসুর একা হইলেও সে দিনও তাঁকে বঙ্গবন্ধু বলেই সম্বোধন করবে তার বইয়ে।' এক্ষেত্রে বলা যায়, আবুল মনসুর আহমদের এক বিরল ইতিহাস নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তায় বসবাস ছিল। যা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সততার পরিচয় দেয়।

অনেকে আবুল মনসুর আহমেদকে ইতিহাসের পাটাতনে রেখে পাঠ করে বলবেন, তিনি যে সাংস্কৃতিক রাজনীতির চর্চা করলেন তার কি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না? উত্তর হবে কোনভাবেই তিনি পক্ষপাতহীন ছিলেন না। পক্ষপাতহীনতা বলে দুনিয়াতে কিছু নাই। ফলে তাঁকে পক্ষপাতহীন বলার উপায়ও নেই। কিন্তু সেই পক্ষপাতিত্ব একজন আত্মসম্মানি, দেশপ্রেমিক মুসলমান বাঙালের পক্ষপাতিত্ব। যার রাজনীতির তলদেশে ছিল পূর্ব বাংলায় আলাদা সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। যেখানে অধিকাংশ নেতা, বুদ্ধিজীবী, চিন্তক অপরাপর সংস্কৃতির মদিরা পান করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে হারিয়ে ফেলেছেন, সেখানে আবুল মনসুর আহমেদই ব্যতিক্রমহীনভাবে শিরদাঁড়া খাড়া রেখে চেয়েছেন এই জনপদের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বর তৈরি করতে। আমরা যে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্ন তাঁকে বাদ দিয়ে দেখার বা চর্চা করার খুব সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। এখানেই আবুল মনসুর আহমেদ সব সময় চিন্তাচর্চার জীবন্ত ধারায় সক্রিয় এবং স্বরাট থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

কেউ একজন ছিল

ফখরুল করিম

আজকাল কাউকে কিছু বলতে পারি না
নিয়মের বাইরে কাউকে ভালবাসতে পারি না
সন্ধ্যার গোধূলিবেলার ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির ধারায়
হৃদয়ে বহমান স্রোতের টানে কেউ আসতে চায় না।

অপেক্ষার প্রহর শেষে বসে থাকি আসবে আগন্তুক হয়ে
কালবৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডবে ভেসে যাবে সব
স্মৃতির বালুচরে ভিড়ে আছে চিরচেনা তোমার মুখ
ভালোবাসা আর ভালোলাগায় খুঁজে নেবো আমাদের সুখ ।

তোমার মতোই কেউ একজন কোনো এক মুহূর্তে হারিয়ে যায়
সুখের সন্ধানে চলে যায় নির্জন কোনো দ্বীপে
কালের পরিক্রমায় এখনো চলছে জীবন একই মায়ায়
হারানো সেই মানুষটি বেঁচে আছে ভালোবাসার আয়নায়।

আপন মনের অন্ধকারে লুকিয়ে রেখো যতন করে
একদিন না হয় দেখা হবে কোনো দূর দিগন্তে
সেইদিন তুমি হাতে হাত রেখে আবার দিয়ো কথা
জীবন চলার পথে সঙ্গী হবে তুমি ভুলে যাবো সব ব্যাথা।

অপেক্ষা

মাজহারুল ইসলাম

ঝুল বারান্দায় চড়ুই দম্পতির কিচিরমিচির
রোজ নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
ছড়িয়ে দেওয়া চালের দানাগুলো
পাখা ঝাপটিয়ে মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়।

শেষের দানাগুলো মুখে পুরে
অনতিদূরে অপেক্ষারত ছানাগুলোর মুখে
ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার যোগান দেয় মা পাখিটা।

মা-বাবার সাথে পনের-বিশ দিন পর
নতুন ছানাগুলো যোগ দেয়
সাথে আরও কিছু বন্ধু-বান্ধব।

আটটা-পাঁচটা অফিস শেষে দ্রুত বাসায় ফিরি-
মিষ্টিমধুর কিচিরমিচির
এক অদৃশ্য সুতোর টানে বেঁধে রাখে জীবন।

আগামী মাসের এক তারিখ
নতুন স্টেশনের হাতছানিতে যেতে হবে অন্যত্র।
পাখিরগুলো হয়তো অপেক্ষায় থাকবে
সংসার হারিয়ে আমিও।

অনিদ্রা আমাদের দেহ ও মনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে

ডা. এম এ হালিম খান

ঘুম মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি শুধু বিশ্রাম নয়, বরং একটি সক্রিয় জীবপ্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শরীর ও মস্তিষ্ক নিজেদের পুনর্গঠন ও মেরামত করে। কিন্তু আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, দুশ্চিন্তা, ডিজিটাল স্ক্রিন, রাতজাগা কাজ, বা অনিয়মিত জীবনযাপন আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ব্যাহত করছে। ফলাফলস্বরূপ, আমরা অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক রোগের শিকার হচ্ছি। একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে– পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ায় প্রায় ১৭২ ধরনের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে, যার মধ্যে রয়েছে: ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, মানসিক রোগ, ক্যান্সার, বন্ধ্যত্ব, ওজন বৃদ্ধি এবং আলঝেইমার বা পারকিনসনের মতো মারাত্মক নিউরোলজিক্যাল রোগ।

ঘুম ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক

ঘুম না হলে আমাদের মস্তিষ্কের glymphatic system ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। এর ফলে মস্তিষ্কে β-amyloid ও tau protein নামক টক্সিক পদার্থ জমতে থাকে, যা আলঝেইমার ও পারকিনসনস ডিজিজের জন্য দায়ী। ঘুম আমাদের স্মৃতিশক্তি, শেখার ক্ষমতা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। ঘুমহীনতায় এগুলোর প্রতিটিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

ঘুম ও হৃদ্‌রোগ

ঘুমের সময় শরীরের sympathetic nervous system বিশ্রামে থাকে। ঘুম না হলে sympathetic drive বাড়ে, রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

বৈজ্ঞানিক তথ্য

প্রতিরাত ৬ ঘণ্টার কম ঘুমালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ২০-৪৮% বেড়ে যায়। (সূত্র : Journal of the American College of Cardiology)

ঘুম ও ডায়াবেটিস

ঘুমের ঘাটতিতে শরীরে ইনসুলিন প্রতিরোধ (insulin resistance) তৈরি হয়। এতে রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে গিয়ে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

গবেষণার তথ্য

মাত্র ৪ দিন ৫ ঘণ্টা করে ঘুমালেই ইনসুলিন সেনসিটিভিটি ৩০% পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

ঘুম ও হরমোনের ভারসাম্য

ঘুমের সময় শরীরে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যেমন growth hormone, melatonin, leptin, ghrelin ইত্যাদি নিঃসরণ হয়। ঘুম না হলে এসব হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

ফলাফল

- ক্ষুধা বাড়ে ⟶ ওজন বৃদ্ধি
- শরীর ঠিকমতো মেরামত হয় না ⟶ দুর্বলতা ও বার্ধক্য
- মহিলা ও পুরুষ উভয়ের প্রজননক্ষমতা হ্রাস পায়

ঘুম ও ক্যানসার

Melatonin নামক হরমোন রাতের ঘুমের সময় নিঃসৃত হয়, যা শরীরে ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করতে সহায়তা করে। ঘুমহীনতায় এই হরমোন কমে যায়।

গবেষণা

- ৬ ঘণ্টার কম ঘুমালে স্তন ক্যান্সার ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি ২ গুণ বাড়ে। (সূত্র : American Cancer Society)

ঘুম ও ওজন বৃদ্ধি

ঘুম কম হলে leptin (ক্ষুধা কমানো হরমোন) কমে যায় এবং ghrelin (ক্ষুধা বাড়ানো হরমোন) বেড়ে যায়। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়, যা স্থূলতা বা ওবেসিটির দিকে ঠেলে দেয়।

ঘুম ও মানসিক স্বাস্থ্য

ঘুমের ঘাটতি মানসিক রোগের জন্য অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ কারণ। ঘুম না হলে দেখা দিতে পারে:

- বিষণ্নতা
- উদ্বেগ
- মনোযোগের ঘাটতি
- মেজাজ খিটখিটে হওয়া
- আত্মহত্যার প্রবণতা

তথ্যসূত্র : WHO I CDC-এর মতে, অনিদ্রা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ৩ গুণ বেশি।

শিশুদের জন্য ঘুমের গুরুত্ব

শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি ঘুমের সময়েই ঘটে। নিয়মিত গভীর ঘুম না হলে দেখা দিতে পারে:

- উচ্চতা ও ওজনের সমস্যা
- শেখার অসুবিধা
- আচরণগত সমস্যা
- ইমিউনিটির দুর্বলতা

সারকাডিয়ান রিদম ও দেহঘড়ির ভাঙন

ঘুমের সময়সূচি অনিয়মিত হলে শরীরের অভ্যন্তরীণ দেহঘড়ি বা সারকাডিয়ান রিদম নষ্ট হয়ে যায়। এটি দীর্ঘমেয়াদে নানা ধরনের বিপদের জন্ম দেয়–

- হজমের সমস্যা
- হরমোন অস্থিরতা
- ত্বকের সমস্যা
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস

ঘুম ও আয়ুর সম্পর্ক

বিজ্ঞানীরা বলছেন– ঘুমের ঘাটতি আমাদের টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেয়, যা কোষের বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে। ফলে আয়ু হ্রাস পায়।

তথ্যসূত্র : University of California-এর গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি রাতে পাঁচ ঘণ্টার কম ঘুমান, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩০ শতাংশ বেশি।

ঘুম শুধু বিশ্রাম নয়– এটি সুস্থতার মূল স্তম্ভ। ঘুমের ঘাটতি একটি 'নীরব ঘাতক' যার প্রভাব সরাসরি আমাদের হরমোন, হৃদপিণ্ড, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা, মস্তিষ্ক, ও মানসিক স্বাস্থ্যে পড়ে। দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা গভীর ও নিরবিচারে ঘুম নিশ্চিত করতে পারলেই আমরা অনেক রোগ ও জটিলতা থেকে বাঁচতে পারি। সুতরাং, ঘুমকে আর অবহেলা নয়– বরং তাকে দিন জীবনের অগ্রাধিকারে।

অনিদ্রা মোকাবেলার উপায়

ঘুম মানুষের মৌলিক জৈবিক চাহিদা। খাদ্য ও পানির মতোই ঘুম ছাড়া সুস্থ জীবন কল্পনা করা যায় না। অথচ আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, প্রযুক্তিনির্ভরতা ও মানসিক চাপের কারণে ঘুমের সমস্যা এখন নীরব এক মহামারিতে রূপ নিচ্ছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নিয়মিত অনিদ্রা বা পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে ভুগছেন। এই প্রেক্ষাপটে 'স্লিপ হাইজিন' ধারণাটি জানা এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

স্লিপ হাইজিন কী?

স্লিপ হাইজিন বলতে বোঝায় এমন কিছু স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস, আচরণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, যেগুলো মেনে চললে নিয়মিত ও গভীর ঘুম নিশ্চিত করা সম্ভব। সহজভাবে বলা যায়, ভালো ঘুমের জন্য যেসব নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন, সেগুলোর সমষ্টিই হলো স্লিপ হাইজিন। এটি কোনো ওষুধ নয় বরং জীবনযাপনের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। মানবদেহের একটি স্বাভাবিক জৈবিক ঘড়ি আছে, যাকে সার্কেডিয়ান রিদম বলা হয়। এই ঘড়ি আলো-আঁধার, সময় ও দৈনন্দিন অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে কাজ করে। স্লিপ হাইজিনের মূল লক্ষ্য হলো এই প্রাকৃতিক ঘড়িকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা।

রাতে ঘুম না হওয়ার কারণ কী?

ঘুম না হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে– পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ায় প্রায় ১৭২ ধরনের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে, যার মধ্যে রয়েছে: ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, মানসিক রোগ, ক্যান্সার, বন্ধ্যত্ব, ওজন বৃদ্ধি এবং আলঝেইমার বা পারকিনসনের মতো মারাত্মক নিউরোলজিক্যাল রোগ

- অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা
- মোবাইল, টিভি ও কম্পিউটারের অতিরিক্ত ব্যবহার
- অনিয়মিত ঘুম ও জাগার সময়
- ক্যাফেইন, ধূমপান ও অ্যালকোহল গ্রহণ
- রাতে ভারী খাবার খাওয়া
- শারীরিক পরিশ্রমের অভাব
- বিষণ্নতা, উদ্বেগ বা অন্যান্য মানসিক সমস্যা

এই কারণগুলো দীর্ঘদিন চলতে থাকলে তা অনিদ্রা বা ইনসমনিয়া নামক রোগে রূপ নিতে পারে।

ভালো ঘুমের জন্য করণীয়: স্লিপ হাইজিনের মূল নিয়ম

১. নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ও জাগা: প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছুটির দিনেও এই নিয়ম বজায় রাখা উচিত। এতে শরীরের জৈবিক ঘড়ি সঠিকভাবে কাজ করে এবং ঘুম স্বাভাবিক হয়।

২. ঘুমের উপযোগী পরিবেশ তৈরি: ঘুমের ঘর হওয়া উচিত নীরব, অন্ধকার ও আরামদায়ক। অতিরিক্ত আলো, শব্দ ও গরম ঘুমের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে। বিছানা কেবল ঘুম ও বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করা উচিত, মোবাইল দেখা বা কাজ করার জন্য নয়।

৩. স্ক্রিন টাইম কমানো: ঘুমের অন্তত এক থেকে দুই ঘণ্টা আগে মোবাইল ফোন, টিভি ও ল্যাপটপ ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। এসব যন্ত্র থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটোনিন নামক ঘুমের হরমোনের নিঃসরণ কমিয়ে দেয়, ফলে ঘুম আসতে দেরি হয়।

৪. ক্যাফেইন ও ধূমপান পরিহার: চা, কফি, এনার্জি ড্রিংক ও ধূমপান স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। বিশেষ করে বিকেলের পর এসব পরিহার করা উচিত। অনেকেই মনে করেন রাতে চা খেলে সমস্যা হয় না, কিন্তু বাস্তবে এটি ঘুমের বড় শত্রু।

৫. রাতে ভারী খাবার না খাওয়া: ঘুমের ঠিক আগে ভারী, তেল-ঝাল বা মসলাযুক্ত খাবার হজমে সমস্যা তৈরি করে, যা ঘুম ব্যাহত করে। তবে খুব খিদে লাগলে হালকা খাবার, যেমন এক গ্লাস গরম দুধ বা অল্প ফল খাওয়া যেতে পারে।

৬. দিনে সীমিত সময় ঘুমানো: দুপুরে দীর্ঘ সময় ঘুমালে রাতে ঘুম নষ্ট হয়। প্রয়োজন হলে ২০–৩০ মিনিটের বেশি না ঘুমানোই ভালো। বিকেল বা সন্ধ্যার পর ঘুমানো সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত।

৭. নিয়মিত শরীরচর্চা: প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম ভালো ঘুমে সহায়ক। তবে ঘুমের ঠিক আগে ভারী ব্যায়াম করলে উল্টো ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।

৮. বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে কী করবেন: অনেকেই ঘুম না এলেও বিছানায় শুয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকেন। এটি একটি ভুল অভ্যাস। ২০-৩০ মিনিটে ঘুম না এলে উঠে হালকা কিছু করা ভালো, যেমন বই পড়া বা শান্ত সঙ্গীত শোনা। ঘুম এলে আবার বিছানায় যাওয়া উচিত।

৯. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: ঘুমের আগে মানসিক প্রশান্তি অত্যন্ত জরুরি। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, ধ্যান, নামাজ বা প্রার্থনা, কিংবা নিজের দুশ্চিন্তাগুলো লিখে রাখা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

ঘুমের অভাবের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি

ঘুম শুধু ক্লান্তি দূর করে না, এটি শরীর ও মস্তিষ্ককে পুনর্গঠনের সুযোগ দেয়। দীর্ঘদিন ঘুমের অভাব হলে–

- ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে
- হৃদরোগ ও স্ট্রোকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়
- স্থূলতা ও হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়
- স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ কমে যায়
- বিষণ্নতা ও উদ্বেগজনিত রোগ দেখা দেয়

অর্থাৎ ভালো ঘুম ছাড়া ভালো স্বাস্থ্য অসম্ভব।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন?

যদি সপ্তাহে তিন দিনের বেশি নিয়মিত ঘুম না হয় এবং এই সমস্যা তিন মাসের বেশি স্থায়ী হয়, তবে সেটি ইনসমনিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া দিনের বেলা অতিরিক্ত ঝিমুনি, কাজের মনোযোগ কমে যাওয়া বা মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। নিজের ইচ্ছেমতো ঘুমের ওষুধ খাওয়া বিপজ্জনক।

ভালো ঘুম কোনো বিলাসিতা নয়, এটি সুস্থ জীবনের পূর্বশর্ত। স্লিপ হাইজিনের নিয়মগুলো সহজ হলেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা মানা কঠিন হয়ে উঠেছে। তবুও সচেতনতা ও অভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে অনিদ্রা জয় করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে– ঘুম ঠিক হলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। তাই আজ থেকেই ভালো ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলাই হোক সুস্থ জীবনের প্রথম পদক্ষেপ।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

একুশের কবিতা

পারভেজ বাবুল

একুশ মানেই দুঃখ শোকের রক্তে লেখা ইতিহাস
একুশ মানেই ভয় হারানো কোটি বাঙালির প্রাণোচ্ছাস।

দেখো দেখো ওই ছেলে হারা কত দুঃখী মা কাঁদে
আকাশ বাতাস কাঁদে করুণ আর্তনাদে
দেখো মা শহিদ মিনারে
হাসছে তোমার রফিক শফিক
ফুল তাই ছড়ায় সুবাস।

ফুলে ফুলে আজ ভরেছে প্রাণের শহিদ মিনার
একুশ আমার একুশ সবার সারা দুনিয়ার
আজ বর্ণমালা বাংলা আমার
বাংলা নামের দেশটি আমার
প্রভাত ফেরির ফাগুন মাস।

একুশ মানেই দুঃখ শোকের রক্তে লেখা ইতিহাস
একুশ মানেই ভয় হারানো
কোটি মানুষের প্রাণোচ্ছাস।

বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৬

এ এস এম জাহীদ

১৩ই ফেব্রুয়ারি-বিশ্ব বেতার দিবস। ইউনেস্কো ঘোষিত এই আন্তর্জাতিক দিবস ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়ে আসছে। রেডিওর গুরুত্ব, সম্ভাবনা এবং সামাজিক দায়িত্ব নতুন করে তুলে ধরতেই এই বিশেষ দিনটির আয়োজন।

এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'Radio and AI' অর্থাৎ বেতার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই প্রতিপাদ্য আমাদের সামনে নতুন এক বাস্তবতা তুলে ধরছে যেখানে বেতার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক, দ্রুত ও কার্যকর করে তুলছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আজ আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বেতার সম্প্রচারে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও নির্মাণ, তথ্য বিশ্লেষণ, আর্কাইভিং, ভাষান্তর এবং শ্রোতাদের চাহিদার বিশ্লেষণ ও বোঝার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

তবে প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার প্রশ্নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এআই ব্যবহার করে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্যের সত্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা, গোপনীয়তা এবং তা পরিবেশনের ক্ষেত্রে অধিকতর দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তথ্য বিকৃতি, অপতথ্য, তথ্য বিভ্রাট বা পক্ষপাত যেন কোনোভাবেই সম্প্রচারের অংশ না হয়– সে বিষয়ে সচেতন থাকা বেতারের নৈতিক দায়িত্ব।

বেতারের সবচেয়ে বড় সম্পদ– বিশ্বাস। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ বেতারের কণ্ঠে আস্থা রেখেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পরও সেই বিশ্বাস যেন অটুট থাকে- সেটাই আজকের দিনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, যাচাইকৃত তথ্য এবং মানবিক উপস্থাপনাই বেতারের প্রতি শ্রোতাদের দীর্ঘস্থায়ী আস্থার ভিত্তি তৈরি করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল ও দুর্যোগপ্রবণ দেশে বেতারের ভূমিকা আজও অপরিসীম। দুর্যোগকালীন সতর্কবার্তা, জনসচেতনতা, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং এ জনভূমির সম্পদ সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণ ও প্রচারে বাংলাদেশ বেতার প্রযুক্তি ও মানবিকতার সমন্বয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের

মাধ্যমে এই সেবাকে আরও দ্রুত, কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে শ্রোতাদের সম্পর্ক সবসময়ই আন্তরিক। সারা দেশে প্রায় ২৫০০টি নিবন্ধিত শ্রোতা ক্লাব, হাজারো চিঠি, ই-মেইল ও অনলাইন যোগাযোগ সবকিছুই প্রমাণ করে, প্রযুক্তির পরিবর্তন হলেও বেতারের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা অটুট রয়েছে।

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র বিশেষ অনুষ্ঠানমালা, আলোচনা সভা এবং শ্রোতাদের নিয়ে অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করেছে। এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে একটি দায়িত্বশীল ভবিষ্যতের বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে।

দীর্ঘ ৮৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী পথচলায় বাংলাদেশ বেতার আজও সত্য, মানবিকতা ও বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের ১৪টি কেন্দ্র ও ৫টি ইউনিটের মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, সম্প্রচারিত হচ্ছে এফএম, এএম ব্যান্ড ও ক্ষুদ্র তরঙ্গে। এর সাথে বাংলাদেশ বেতারের ওয়েবসাইট www.betar.gov.bd, মোবাইল অ্যাপ, ফেইসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান শোনা যাচ্ছে।

রেডিও এখন আর শ্রবণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং নতুন সম্প্রচার ধারণা ব্যবহার করে সম্প্রচার কৌশলে এনেছে ব্যপক পরিবর্তন। বাংলাদেশ বেতার এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ বেতার বর্তমানে অডিও সম্প্রচারের পাশাপাশি অডিও ভিজ্যুয়াল কন্টেন্টের মধ্যমে আরও আকর্ষণীয়, তথ্যবহুল সেবা দিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটি নিউ মিডিয়ায় পদার্পণ করেছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক, ইউটিউব, বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব ওয়েব পেইজে নিয়মিতভাবে সংবাদ ও অনুষ্ঠানমালা আপলোড করে চলেছে। যার ফলশ্রুতিতে বেতার ও দর্শক শ্রোতার সম্পর্ক উন্নয়নে এক ব্যপক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

শ্রোতাদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ- 'বাংলাদেশ বেতার' অ্যাপটি ডাউনলোড করুন এবং অন্যদেরও ডাউনলোড করতে উদ্বুদ্ধ করুন। আপনি যেখানেই থাকুন, বাংলাদেশ বেতার সবসময় আপনার সাথেই আছে।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

সম্প্রচারের অনুগল্প : অডিয়োগ্রাম পরিবেশনা

দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব

'অডিয়োগ্রাম' শব্দটির সঙ্গে আমরা অনেকেই কমবেশি পরিচিত। অনেকে আবার বলেন, 'পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম'। মূলত, পেশাদারভাবে যারা সম্প্রচার জগতে কাজ করে থাকেন, তাদের কাছে এই নির্মাণ ফরম্যাটটি খুব একটা অপরিচিত হবার কথাও নয়। সংজ্ঞা দিয়ে বলতে গেলে, 'অডিয়োগ্রাম' হলো নির্দিষ্ট অডিয়ো কনটেন্টকে ভিত্তি করে নির্মিত ভিডিয়ো কনটেন্ট, যেখানে অডিয়ো সিগন্যালের দৃশ্যায়নসহ একাধিক স্তরে সন্নিবিশিত উপকরণসমূহ, যেমন : টেক্সট, স্থির চিত্র অথবা ভিডিয়ো চিত্রসমূহ সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট ধারাক্রমে সংযুক্ত করে গতিশীলভাবে উপস্থাপন করা হয়। এখানে উপস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো মূলত ব্যবহারকারীকে আকৃষ্ট করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি চলমান ভিজ্যুয়াল ওয়েভ মোশনের সঙ্গে অ্যানিমেটেড টেক্সট ও চিত্রযুক্ত ভিডিয়ো কনটেন্টই হলো মিডিয়ার দৃষ্টিকোণে অডিয়োগ্রাম কনটেন্ট। এই ধরনের অডিয়ো-ভিজ্যুয়াল কনটেন্টে গ্রাফিক আর্ট, অডিয়ো ট্র্যাক এবং টেক্সট বা লিখিত শব্দসমূহকে একত্রে সন্নিবিশিত করে ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনলাইন মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। মূলত, রেকর্ডেড অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে এই ফরম্যাটের সুনিপুণ ব্যবহার বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

যাঁরা অডিয়ো মিডিয়া নিয়ে পেশাদারভাবে কাজ করেন, তাঁদের জন্য অবশ্য পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম সম্পর্কে কিছুটা অ্যাডভান্স লেভেলের ধারণা থাকাটা পেশাদারি দায়িত্ব পালনের জন্যেও বেশ উপকারী। কারণ, অনলাইন জগতে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, পডকাস্ট অডিয়োগ্রামভিত্তিক প্রমোশনাল কনটেন্ট একটি সম্প্রচার কেন্দ্রের জন্য ট্রেইলারের মতো কাজ করে। যথার্থ শিল্পমান সহকারে নির্মিত মৌলিক অডিয়োগ্রাম, বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তনশীল এবং সদাবিবর্তিত মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপের প্রেক্ষাপটে অডিয়ো কনটেন্টকে একজন শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের দুরূহ চ্যালেঞ্জকে কিছুটা হলেও সহজতর করে। আর বেতার সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত আপ্তবাক্য, 'রেডিয়োর বুলি আর বন্দুকের গুলি একবার গেলে আর না মেলে'– এই চিরায়ত প্রবাদকে অসত্য করে দিয়েছে হাল

আমলের মিডিয়া কনভার্জেন্সেজনিত বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়ে চলা অনলাইন মিডিয়ার সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী জগৎ।

আগে যেমনটি হতো যে রাষ্ট্রীয় জরুরি ঘোষণা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু জনগণকে জানানোর জন্য বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্রগুলোকে অন-এয়ার লিনিয়ার স্লটজনিত সীমাবদ্ধতার কারণে যুগপৎ একাধিক চ্যানেল থেকে একসঙ্গে প্রচারের সুযোগ না থাকায় পুনঃপ্রচারের মাধ্যমে একই বার্তা বারবার প্রচার করে মানুষকে সচেতন করা হতো। কিন্তু, এখন এযুগে অনলাইনের সুবাদে এই সীমাবদ্ধতা ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এখন জনগুরুত্বসম্পন্ন ঘোষণা এবং অনুষ্ঠান ওয়েবসাইট বা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করলে অথবা অনুষ্ঠানগুলোকে পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম আকারে ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে অডিয়েন্সের মাঝে লিংক শেয়ার করলে মানুষ সহজেই পছন্দের অনুষ্ঠানটি প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার শুনতে পারেন, দেখতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন, নিজের প্রয়োজনে ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারেন। চাইলে নিজের আড্ডার মহলে বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

পেশাজীবীরা নিজের উন্নয়নে বা নিজ কমিউনিটির উন্নয়নে বেতার এবং টিভির মৌলিক অডিয়োগ্রাম কনটেন্ট বৃহত্তর পরিসরে শেয়ার করতে পারেন অথবা গবেষণামূলক কাজে ব্যবহার বা বিশ্লেষণও করতে পারেন। ফলে বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠানগুলো আজ সহজেই শ্রোতার স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে একজন থেকে বহুজনে শেয়ার করার সুযোগ রয়েছে। এই যে 'শেয়ার' কথাটি বলছি, এর জন্যও পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম কনটেন্টের জুড়ি মেলা ভার। তাই, যদি এই প্রশ্ন করা হয়, এত বিকল্প থাকতে কেন আমরা পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম ফরম্যাটে অডিয়ো অনুষ্ঠান নির্মাণ করব? এই প্রশ্নের মোটা দাগে উত্তর হতে পারে দুটি। প্রথমত, এই ফরম্যাটে শ্রোতার স্মার্ট ফোনে বা ব্যক্তিগত অনলাইন প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠানের দৃষ্টিনন্দন ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন তুলনামূলক কম খরচে করা সম্ভব। এখন উৎসুক পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, কতটা কম খরচে 'পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম' নির্মাণ করা যায়? এর সরাসরি উত্তর অবশ্য দেওয়া বেশ কঠিন। তবে, একই স্থিতির ভিডিয়ো অনুষ্ঠান প্রযোজনার বিশাল ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করলে, 'পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম' নিঃসন্দেহে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচেই নির্মাণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, মিডিয়া জগতে কনটেন্টের 'নির্মাণ ব্যয়' সব সময়ই কনটেন্টের 'গুণমান'-এর সঙ্গে ধনাত্মকভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ জগতে একটি তিন মিনিটের প্রমোশনাল কনটেন্টের জন্য ৩০ হাজার টাকা যেমন খরচ করা যায়, তেমনি আবার ৩ লাখও ছাড়িয়ে যেতে পারে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সৃষ্টিশীল জগতের এই বাস্তব অভেদ্য ধনাত্মক আপেক্ষিক সম্পর্ক অনেককেই বিচলিত করলেও, এটি আবার বহুজনকে পুলকিতও করে। সোশ্যাল মিডিয়ার জয়-জয়কারে সবাই আজ সস্তার খোঁজে মগ্ন। কিন্তু পেশাদারি মিডিয়া জগতের বাস্তবতা বড়ই রুক্ষ। এখানে কপিরাইট, বুদ্ধিবৃত্তিক মালিকানা, জনস্বার্থ, জনমত, শিল্পীসত্তা, মৌলিকত্ব এ ধরনের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই, খরচের বিষয়ে বিচলিত বা পুলকিত হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ আজও আমার অজানা। বিষয়টিকে আমার কাছে অনেকটা চিরস্থায়ী সংকট বলেই মনে হয়। তবে, বিষয়টিকে যদি সমাজ বিনির্মাণে জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তাহলে আমার ধারণা সংকটের স্থায়িত্ব কিছুটা হলেও কমে আসবে। দ্বিতীয়ত, পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম হলো বর্তমান সময়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে অত্যন্ত শেয়ার উপযোগী অডিয়ো মিডিয়া কনটেন্ট। যে কথাটি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি। আসলে আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম বা অন্য যে-কোনো প্ল্যাটফরমে এই পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম খুবই সহজে নান্দনিকভাবে শেয়ার করা যায় এবং জনস্বার্থে নির্দিষ্ট লক্ষ্যদলকে বিবেচনায় নিয়ে সহজেই ডিজিটাল ক্যাম্পেইন এবং বুস্টিংও করা যায়।

পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম কনটেন্টের মাধ্যমে দর্শক ও ব্যবহারকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাধারণত বিষয়বস্তুর একটি প্রতিনিধিত্বশীল স্থির চিত্রকে স্ক্রিনের প্রধান পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে অডিয়ো, ভিজ্যুয়াল আর্ট এবং টেক্সট উপাদান ব্যবহার করা হয়। মূলত, এই ফরম্যাটের কনটেন্ট একটি সাধারণ অডিয়ো লিংক অথবা একটি স্থির চিত্রের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে। ভোক্তা নিজ স্মার্ট ফোনে কনটেন্টের ছবি দেখেই বুঝে ফেলতে পারেন কনটেন্টের বিষয়। ফলে এক ঝলকে প্রথম দর্শনেই আকর্ষণীয় কনটেন্টের ক্ষেত্রে ভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে অডিয়োগ্রাম কনটেন্ট।

এখন আগ্রহী পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, পডকাস্ট এবং পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম কি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর হলো– কিছুটা, সবটুকু নয়। আসলে, অনলাইন অঙ্গনে বহুল ব্যবহৃত পডকাস্ট শব্দটি মূলত দুটি শব্দের সমন্বয় থেকে উদ্ভূত। প্রথমটি হলো আইপডের 'চঙউ বা পোর্টেবল অন ডিম্যান্ড' শব্দাংশ এবং দ্বিতীয়টি হলো ইংরেজি ব্রডকাস্ট শব্দের শেষাংশ 'কাস্ট'। এই দুটির মিলনে সম্মিলিত শব্দ 'Podcast'। অনেকেই প্রশ্ন করেন পডকাস্ট অডিয়ো ফাইল নাকি ভিডিয়ো ফাইল? নীতিগতভাবে পডকাস্ট হলো অনলাইন প্ল্যাটফরমে বিতরণকৃত একটি ডিজিটাল অডিয়ো ফাইল যা ব্যবহারকারীর মাঝে সহজে শেয়ার উপযোগী এবং ডাউনলোড যোগ্য। সুতরাং সাধারণ অডিয়ো ফাইল থেকে পডকাস্টের ভিন্নতা হলো– এগুলো যে-কোনো সাধারণ ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে ব্যবহার-উপযোগী এবং ব্যবহারকারী চাইলে পছন্দের পডকাস্ট ডাউনলোড অথবা শেয়ার করতে পারেন। ব্যবহাকারীদের সুবিধার জন্য পডকাস্টে একটি স্থির চিত্র এবং শিরোনামসহ কিছু টেক্সট বার্তা দেয়া থাকে। পডকাস্টের ব্যাবহারিক প্রয়োগ দেখার জন্য বিবিসি রেডিয়ো ফোর-এর ওয়েবসাইট ভিজিট করে দেখতে পারেন, কিংবা বিবিসি পডকাস্ট সাইটিও ব্রাউজ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বর্তমান সময়ের একটি জনপ্রিয় পডকাস্ট সিরিজ হলো 'মোর অর লেস'। টিম হারফোর্ড উপস্থাপিত বিবিসি রেডিও ফোর থেকে প্রচারিত এই পডকাস্টগুলোতে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিতর্ক, সংবাদ এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয় এবং কখনো কখনো তা বিবৃত উপাত্তকে খণ্ডন করে প্রকৃত চিত্র অডিয়েন্সের কাছে তুলে ধরে। যা-ই হোক, এবার আসি পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম প্রসঙ্গে। সাধারণভাবে, একে বলা যেতে পারে অনলাইন প্ল্যাটফরমে বিতরণ করা একটি ভিডিয়ো ফাইল, যা

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতারের অনলাইন প্ল্যাটফরম থেকে প্রচারিত অডিয়োগ্রাম ফরম্যাটের একটি প্রমোশনাল কনটেন্ট।

পডকাস্ট ফাইলের পরিষেবার অডিয়ো সিগন্যালসমূহকে গতিশীল তরঙ্গ আকারে আরো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে।

পেশাদার পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম নির্মাণ করতে হলে বেশ কিছু উপকরণের আবশ্যকতা রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই হলো একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সিস্টেম। এরপর প্রয়োজন হবে কিছু লাইসেন্সকৃত সফটওয়্যার। যেমন– ছবি, টেক্সট এবং নকশা, ভিডিয়ো ফুটেজ কাস্টমাইজেশন এবং অডিয়ো সিগন্যাল অ্যানিমেশনের জন্য প্রয়োজন হবে কিছু বিশেষায়িত সফটওয়্যার। আবার, সবগুলো সম্পাদিত উপকরণকে মিক্সড-ডাউন করে এক্সপোর্টের জন্যও এনকোডার ধরনের সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন হবে দায়িত্বশীল এবং দক্ষ কর্মী। এরপর ফলাফল প্রকাশ এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়।

তবে মজার বিষয় হলো সীমিত প্যারামিটার ব্যবহারে সম্মত থাকলে কিংবা মেনে নিতে পারলে অনলাইন জগতে একেবারে বিনা মূল্যে অডিয়োগ্রাম তৈরি করা যায় এমন বহু সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এরকই কিছু অনলাইন সফটওয়্যারের অন্যতম হলো– দি হেডলাইনার, অডিয়োগ্রাম, ওয়েভি। এই অনলাইন সফটওয়্যারগুলোর ফ্রি ভার্শন যেমন আছে, আবার একই সঙ্গে কাস্টমাইজড কনটেন্ট তৈরির জন্য বিভিন্ন প্ল্যানের আওতায় পেইড ভার্শনও রয়েছে। চাইলে যে-কেউ ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তবে পেশাদার কাজে কখনোই ফ্রি ভার্শন ব্যবহার করা উচিত নয়। এ ধরনের প্রবণতা প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পেশাদারিত্বকে ধ্বংস করে দেয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, বিবিবি, ডয়েচেভ্যালে বা এনএইচকের মতো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাদার সফটওয়্যার ব্যবহারে কর্মীদের নিয়মিত হালনাগাদ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পেইড অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহারে উৎসাহী করা হয়। এই চর্চা প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে দুটি ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। প্রথমটি হলো, নিজস্ব কম্পিউটার সিস্টেমে লাইসেন্সকৃত সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বিষয়বস্তুর গভীরে ঢুকতে পারেন। অডিয়োগ্রাম কনটেন্টে সফটওয়্যারের মাধ্যমে কী কী জাদু কতটুকু মাত্রায় প্রদর্শন করা সম্ভব, সেসম্পর্কে কর্মীরা সক্ষম হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে মজার বিষয় হলো, আপনি যদি একটি সফটওয়্যারে দক্ষ হয়ে ওঠেন, তার মানে হলো একই বিষয়ের অন্য ব্র্যান্ডের সফটওয়্যারের বেসিক ধারণা আপনার এমনিতেই হয়ে যায়। ফলে নতুন প্রযুক্তি ও পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা কর্মীদের মধ্যে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, এই কর্মীরাই যখন সফটওয়্যারের এই গভীর দক্ষতা নিয়ে পেইড অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহারে এগিয়ে যান, তখন তারা মূলত অডিয়োগ্রাম কনটেন্টের সর্বশেষ পপুলার ট্রেন্ড বিষয়ে অবগত হবার একটি দারুণ সুযোগ পান। ফলে, সময়ের আবর্তে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করা কর্মীরা তাদের অর্জিত দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছুতে পারেন এবং এই অর্জন তাদের আত্মবিশ্বাসকে যেমন বাড়িয়ে তোলে তেমনি প্রতিযোগিতামূলক মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির সদা পরিবর্তনশীল ল্যান্ডস্কেপে নিজের যোগ্যতাকে বিক্রয়যোগ্য হিসেবেও তুলে ধরতে পারেন। তবে এদুটি মোটা দাগের সুবিধার বাইরেও তথ্যপ্রযুক্তির সদা বিকাশমান দুনিয়ায়, বর্তমান এআই প্রযুক্তির যুগে ফ্রি সফটওয়্যারের ব্যবহার খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এতে বিপজ্জনক ম্যালওয়্যার এবং হ্যাকিংজনিত দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তাই, অগ্রসর প্রতিষ্ঠানে ফ্রি সফটওয়্যারের ব্যবহার যেমন একদমই নিষিদ্ধ, তেমনি ফ্রি অনলাইন প্ল্যাটফরমে কনটেন্টের সংরক্ষণও একদমই অগ্রহণযোগ্য।

অডিয়োগ্রাম কনটেন্টের নির্মাণকালে কিছু বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হয়। প্রথম বিবেচনার বিষয় হলো অ্যাসপেক্ট রেশিও। একটি অডিয়োগ্রাম কনটেন্ট বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট রেশিওতে স্ক্রিনে তুলে ধরা যায়। জনপ্রিয় অনুপাতগুলো হলো ১৬:৯ (ওয়াইড স্ক্রিন), ৯:১৬ (ভার্টিক্যাল স্ক্রিন), ১:১ (স্কয়ার স্ক্রিন), ২১:৯ (সিনোমাটিক স্ক্রিন), ৪:৩ (ফুল স্ক্রিন) ইত্যাদি। তবে এর বাইরেও নিজস্ব লক্ষ বিবেচনায় নিয়ে আরো বিভিন্ন অনুপাতে কাস্টমাইজড রেশিওতেও কনটেন্ট নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে, প্রথমদিকে ওয়াইড স্ক্রিন রেশিওতেই কাজ শুরু করা উচিত। এই রেশিওতে এইচডি ভার্শনে পিক্সেল রেশিও হলো ১৯২০/১০৮০ পিএক্স। এরপর কিছুটা অভিজ্ঞ হলে অন্য অনুপাতগুলো দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। এরপরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি প্রতিনিধিত্বশীল স্থির চিত্র নির্বাচন। এই ছবিটিই বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফরমে থাম্বনেইল হিসেবে প্রদর্শিত হবে। অনলাইন জগতের একটি সাধারণ প্রবণতা হলো, ব্যবহারকারী যদি কনটেন্টের ভিজ্যুয়াল উপাদানটিতে আকৃষ্ট হন, তবে কনটেন্টের রিচ বা বিস্তৃতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা ইতিবাচক হয়। সুতরাং, অডিয়োগ্রামের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছবিটি নির্বাচন করা এবং এতে প্রয়োজনীয় ইমপ্রোভাইজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। সচরাচর ওয়েবসাইটে যে ধরনের ছবি দেখে ব্যবহারকারী অভ্যস্ত, সম্ভব হলে সেই প্যাটার্নের ছবি এড়িয়ে কিছুটা সৃজনশলী ছবি ব্যবহার করা উচিত। এটি ব্যবহারকারীদের ক্লিকের সম্ভাবনা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ আবার বিষয়বস্তুর চাহিদার কারণে অডিয়োগ্রামে একটি ছবির পরিবর্তে একাধিক ছবির ব্যবহার কিংবা মোশন ফুটেজ অথবা অ্যানিমেটেড ভিজ্যুয়াল আর্টও ব্যবহার করেন। এবার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কনটেন্টের শিরোনামসহ অন্যান্য টেক্সট লিখন, যা পড়ে কনটেন্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যবহারকারী ধারণা পাবেন। এই টেক্সট লেখার ক্ষেত্রে পেশাদার প্রতিষ্ঠানে সততার আবশ্যকতা রয়েছে। ভিউ বৃদ্ধির জন্য চটকদার এমন কোনো শিরোনাম লেখা উচিত নয়, যার কারণে একজন ব্যবহারকারী নিজেকে প্রতারিত ভাবার সুযোগ পান। উদাহরণস্বরূপ, শিরোনাম লেখা হলো– বাংলাদেশি নভোচারীর চন্দ্র বিজয়ের গল্প। কিন্তু কনটেন্টে শুনে জানা গেল এটি একজন বাংলাদেশির চন্দ্র বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে কিছু কবিতার পরিবেশনা মাত্র, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হলো! এ ধরনের শিরোনাম প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্ততার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

চতুর্থত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো অডিও ট্র্যাকের পেশাদারি নির্মাণ। অবশ্যই একজন প্রযোজক বর্তমান এআই প্রযুক্তির যুগে অভিজ্ঞ ভিডিয়োগ্রাফারের সহায়তায় চাকচিক্যময় ভিডিয়োগ্রাফি, আকর্ষণীয় গতিশীল অডিয়ো তরঙ্গরূপ এবং চটকদার শিরোনাম লিখে একটি দারুণ অডিয়োগ্রাম নির্মাণে উদ্যোগি হতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, এত কিছুর পরেও একটি ভালো মানের মৌলিক অডিয়ো ট্র্যাক ছাড়া আপনার অডিয়োগ্রাম মূলত অর্থহীন। কারণ অডিয়োগ্রামের ক্ষেত্রে মূল উপজীব্য হলো অডিয়ো ট্র্যাক। এটি ভালো হলে অন্য সকল উপাদান সম্মিলিতভাবে অডিয়োগ্রাম কনটেন্টকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। এক্ষেত্রে অডিয়ো ভয়েসের মানও গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক মিউজিক, বাইট, সাইলেন্স, আর সাউন্ড ইফেক্টের জাদুকরি মিশ্রণে সম্পূর্ণ বিষয়টি হতে হবে যুগোপযোগী এবং শ্রবণ চাহিদার বাস্তব প্রকাশ। এ ধরনের কনটেন্ট তৈরির সক্ষমতা নির্মাতার মাঝে একদিনে গড়ে ওঠে না, বরং অব্যাহত আনন্দ মিশ্রিত কাজের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং একই সঙ্গে ট্রায়াল অ্যান্ড ইররের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। একজন পেশাদার নির্মাতার অডিয়ো কনটেন্ট এবং বেতারপ্রেমী শ্রোতার

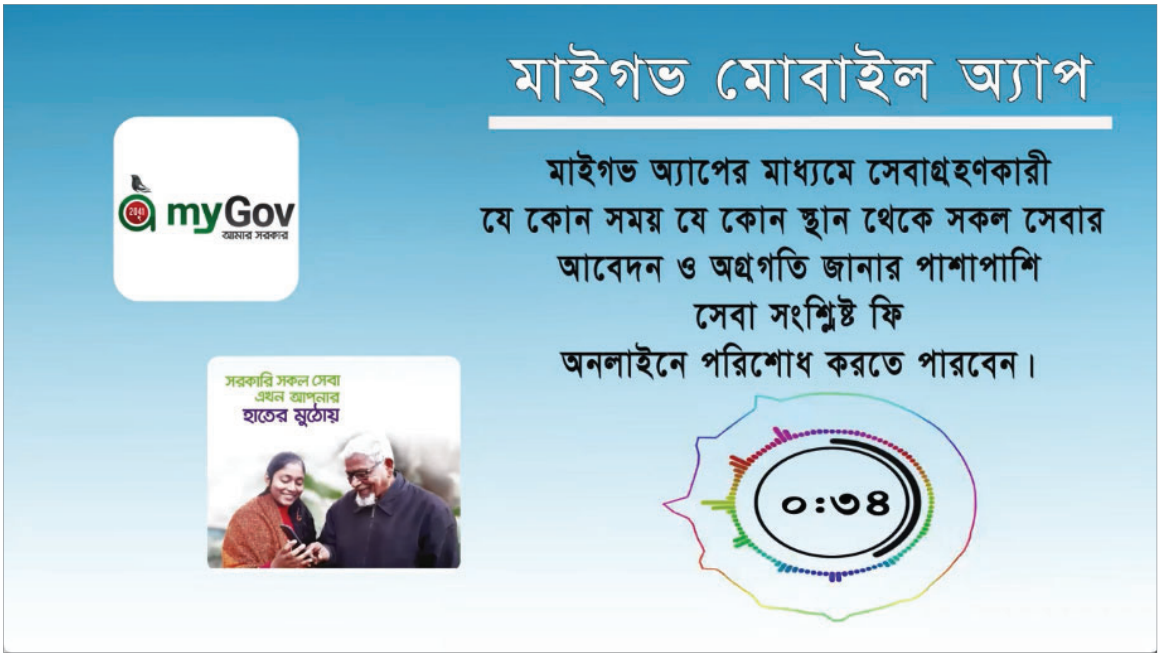

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার থেকে ১৬:৯ বা ওয়াইড স্ক্রিন রেশিওতে নির্মিত একটি অডিয়োগ্রাম প্রমোশনাল কনটেন্টের ৩৪তম সেকেন্ডের স্থির চিত্র।

> এখন জনগুরুত্বসম্পন্ন ঘোষণা এবং অনুষ্ঠান ওয়েবসাইট বা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করলে অথবা অনুষ্ঠানগুলোকে পডকাস্ট অডিয়োগ্রাম আকারে ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে অডিয়েন্সের মাঝে লিংক শেয়ার করলে মানুষ সহজেই পছন্দের অনুষ্ঠানটি প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার শুনতে পারেন, দেখতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন, নিজের প্রয়োজনে ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারেন

নির্মিত অডিয়ো কনটেন্টের মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য থাকা খুবই জরুরি। এই ব্যবধান না থাকলে পেশাদারিত্ব শূন্যের কোটায় নেমে আসার প্রবণতা তৈরি হয়। মানুষ আপনাকে কেন শুনবে? কারণ সে যখন বিশ্বাস করবে যে, আপনার প্রযোজনার মান অন্যান্য প্রযোজনা থেকে উন্নত ও নির্ভরযোগ্য, তখনই শ্রদ্ধার বীজ বপিত হয়। শ্রবণের আগ্রহ তৈরি হয়। মানুষ স্বাভাবিক পরিবেশে সব সময়ই শিখতে এবং নিজের দক্ষতার উত্তরণ চায়। এটি মানুষের মৌলিক চেতনাবোধ। এজন্যই উন্নত এবং বিকশিত সমাজে জ্ঞানীর কদর থাকে।

একটি অডিয়ো প্রযোজনার ক্ষেত্রে সৃজনশীল অভিনয় ধারণ, মৌলিক মিউজিকের ব্যবহার, যথার্থ সাউন্ড ইফেক্ট, রয়্যালটির স্বত্ব প্রদান, পেশাদারি অডিয়ো ইফেক্টের চৌকশ ব্যবহারসহ হালনাগাদ বিশ্বমানের অডিয়ো সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের ট্রেন্ডিং সব টুলসের ব্যবহার কনটেন্ট নির্মাণে আধিকারিককে মার্কেট লিডারে পরিণত করে। এগুলোর আবার পেশাদারি ব্যবহারের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রথা তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক বাজেটে অডিয়োগ্রাম নির্মাণ খাতের স্বীকৃতিসহ জনস্বার্থে অর্থ বরাদ্দ। তবে, সরকারি দফতর হলে, বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে অডিয়োগ্রাম নির্মাণ খাতের স্বীকৃতির বিষয়টি সময়সাপেক্ষ হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ নিলে বিষয়টি মোটেই কঠিন কোনো কাজ আর থাকে না। তবে, আবারও বলছি অডিয়োগ্রাম কনটেন্ট নির্মাণে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো মৌলিক অডিয়ো ট্র্যাক নির্মাণ। সস্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পাইরেটেড উপকরণ দিয়ে ট্র্যাক নির্মাণ করলে সেই কনটেন্ট অনলাইন জগতে শেয়ার করা বিপজ্জনক– এতে কপিরাইট ক্লেইমের ঝুঁকি থাকে। যা-ই হোক, এবার অডিয়োগ্রাম নির্মাণ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এতক্ষণ বর্ণিত এক থেকে চার পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো নির্বাচন ও নির্মাণ সম্পন্ন হলে, পঞ্চম ও শেষ স্তরে এসে আমরা উপকরণগুলোর সমন্বয় ও সম্পাদনা করে সফটওয়্যারের সহায়তায় অডিয়ো ট্র্যাকের সিগন্যালের ওপর ভিত্তি করে কনটেন্টে ভিজ্যুয়াল ওয়েব মোশন যুক্ত করব। কম্পিউটার ব্রাউজারে https://www.headliner.app/ লিখে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। হেড লাইনার যকটুকু জানি ৬০ মিনিট পর্যন্ত ফ্রি অডিয়োগ্রাম নির্মাণের সুবিধা দিয়ে থাকে। তবে, এই ফ্রি ব্যবহার শুধু শিখনের জন্যই অনুমোদনযোগ্য বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।

একটি মৌলিক অডিয়োগ্রাম কনটেন্ট নির্মাণের পর বিবেচ্য বিষয় হলো, কনটেন্টের স্টোরেজ এবং অডিয়েন্সের মাঝে ডিস্ট্রিবিউশন। অবশ্যই পেশাদারি প্রতিষ্ঠানের কনটেন্টসমূহকে নিজস্ব অনলাইন স্টোরেজে আপলোড করে শেয়ার করা উচিত। এই অনলাইন স্টোরেজ হলো প্রতিষ্ঠানের অনলাইন সিন্দুক। এখানে নিরাপদে সকল কনটেন্টের সংরক্ষণ ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনে যে-কোনো পুরোনো অনুষ্ঠান পুনরায় শোনার সুযোগ প্রদান করে। এই সিন্দুকের যথার্থ ব্যবহার জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সম্প্রসারণের বিষয়টিকেও অনুপ্রাণিত করে। বিবিসি, ডয়েচেভ্যালে, এনএইচকে এরা সবাই নিজস্ব কনটেন্ট নিজস্ব অনলাইন ক্লাউড স্টোরেজে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট ইউআরএলের মাধ্যমে বিতরণ করে থাকে। সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফরমগুলো হলো সামাজিক প্রচারণার একটি টুলস বা কৌশলী হাতিয়ার মাত্র। সেখানে প্ল্যান বি হিসেবে কনটেন্ট আপলোড বা লিংক শেয়ার করা যেতে পারে কিন্তু সেই প্ল্যাটফরম কখনই প্রধান স্টোরেজ সেন্টার হওয়া প্রতিষ্ঠানের অনলাইন নিরাপত্তার জন্য কাম্য নয়। তাই, প্রতিটি পেশাদার সম্প্রচারকেন্দ্রের নিজস্ব অনলাইন ক্লাউড স্টোরেজসহ চিত্তাকর্ষক ওয়েবসাইট থাকা প্রয়োজন। এ ধরনের ওয়বসাইটের একটি চমৎকার উদাহরণ হলো বিবিসি ডট কম। বিবিসি তাদের তিন স্তরের অর্থ্যাৎ ন্যাশনাল, রিজিওনাল এবং লোকাল সম্প্রচার কেন্দ্রগুলোর স্বতন্ত্র ও সমন্বিত উপস্থাপন তাদের একক বিবিসি ডট কম সাইটে করে থাকে।

গবশেষে বলব, একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, অডিয়োগ্রাম কনটেন্ট নির্মাণ এবং অনলাইন মাধ্যমে বিতরণ করা হলো মূলত অধিক মাত্রায় অডিয়েন্সের কাছে উপস্থিতি বৃদ্ধির একটি আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা এবং একই সঙ্গে কনটেন্টের প্রতি অডিয়েন্সের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার জন্য একটি সহজ মার্কেটিং টুল মাত্র। লক্ষ্যদল সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই মার্কেটিং টুলের ব্যবহার সফলতা লাভের সম্ভাবনাকে নিশ্চিতভাবে বাড়িয়ে তোলে। তাই অডিয়োগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং মুনশিয়ানার সঙ্গে এই ফরম্যাটের ব্যবহার যে-কোনো নির্মাতার জন্যই তার পেশাদারি ও সৃষ্টিশীল মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের কাজকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিতে অধীন কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার বিকল্প নেই। এ ধরনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি চর্চার ফলে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান যেমন শক্তিশালী হয়ে ওঠে তেমনি শক্তিশালী হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ভাবমূর্তি। পাবলিক ডোমেইনে এমন অনুকূল পরিবেশ বোধ করি আমরা সকলেই কামনা করি! পাঠকবৃন্দ, এ বিষয়ে কী ভাবছেন আপনারা?

লেখক : এনএইচকে ওয়ার্ল্ড– জাপান বাংলা সার্ভিসে ব্রডকাস্ট স্পেশিয়ালিস্ট হিসেবে কর্মরত।

তারুণ্যের কণ্ঠ

তরুণের স্বদেশ ভাবনা

আমি এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। যেখানে মেয়েদের রাস্তায় চলতে ভয় থাকবে না, আর পুরুষদেরও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে না। একটি দেশ যেখানে সবাই নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারবে নির্ভয়ে। ন্যায়বিচার হবে নিশ্চিত ও সমান। পরিচয় বা ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়। আইন সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর হবে। এই বাংলাদেশ হবে মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও নিরাপদ।

কাজী আনহারা বাশার প্রিয়তি
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE)

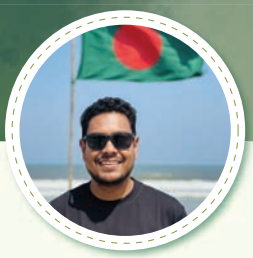

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে এমন একটি দেশ, যেখানে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শান্তি ও মর্যাদার সাথে বসবাস করবে। একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। জবাবদিহিমূলক রাজনীতির কারণে রাষ্ট্র ও রাজনীতির ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হবে। পাশাপাশি সবাই চাকরির পেছনে দৌড়াবেনা বরং দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও পরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হবে, যাতে সবাই সম্মানের সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

মুসফিক হাসান
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, সিএসই বিভাগ

বাংলাদেশ হবে আবহমান গ্রামবাংলার চিরাচরিত প্রকাশিত রূপ যেখানে উন্নয়ন, নগরায়ন সবকিছুই হবে সুপরিকল্পিত, সজীব। যা আজ অনেকাংশেই বিলুপ্তির পথে। বাংলার মানুষ হবে সুশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত, শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন, নীতিসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ, সহানুভূতিশীল, পরমতসহিষ্ণু। এই দেশে যেমন আলোচনা, সমালোচনা হবে গঠনমূলক, তেমনি দেশের সর্বস্তরের মানুষ যেন সেই আলোচনা, সমালোচনার সুযোগ পায় তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। জাত, পাত্রভেদে কেউ অধিকার বঞ্চিত থাকবে না, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সবাই তাদের প্রাপ্য অধিকার যেন পায়। সর্বোপরি আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বলতে চাই দেশের প্রত্যেকটা মানুষের মূলনীতি হবে একটাই, 'দেশের স্বার্থই নিজের স্বার্থ'।

জাওয়াতা আফনান জয়া
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। জন্মদাত্রির প্রতি যে দায়, সেরকমই দায় আমার জন্মভূমির প্রতি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম অসাম্প্রদায়িকতা ও নিরপেক্ষতাকে ধারণ করে ১৯৭১ সালে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে। ২৪ এর রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে। আমার প্রত্যাশা, আগামীর বাংলাদেশে আমাদের সেই আকাঙ্খাকেই ধারণ করে এগিয়ে যাবে। সকল দল-মত ও নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবু রায়হান কবির রাসেল
উপস্থাপক, বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ও
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমি এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা থাকবে, সবার সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে, বাক্ স্বাধীনতা থাকবে, সবাই নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারবে। এমন একটি বাংলাদেশ, যেই বাংলাদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত, স্বনির্ভর ও উন্নত।

আকিব হাসান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

বাংলাদেশ পরিচালনায় সামগ্রিক প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকুক। যাতে সাম্প্রতিক প্রজন্ম পূর্ব প্রজন্মের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দেশ পরিচালনা করতে পারে। নৈতিকতা, দক্ষতা ও দূরদর্শী তারুণ্যের নেতৃত্বের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হলে সুষ্ঠু দেশ পরিচালনার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প প্রভৃতি প্রত্যেকটি খাতে সমান গুরুত্বারোপ করা হবে। সর্বোপরি, দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও ঐক্যের ভিত্তিতে সকলে একসাথে কাজ করলে স্বকীয়তাসম্পন্ন, স্বনির্ভর ও মর্যাদাশীল বাংলাদেশে পরিণত হবে।

রাহেলা আক্তার মুক্তা
শিক্ষার্থী, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে মানুষ স্রেফ 'মানুষ' হিসেবে সম্মানের সাথে স্বাধীনভাবে বাস করার অধিকার লাভ করবে। যেখানে থাকবে না কোনো বাড়াবাড়ি, হিংসা-বিদ্বেষের ছড়াছড়ি। যেখানে নোংরা রাজনীতির বলি হয়ে কোনো মায়ের কোল খালি হবে না। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জনগণের নাভিশ্বাস উঠবে না। বেকারত্বের কষাঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে তরুণ প্রজন্ম বলে উঠবে না, 'এর চেয়ে বিদেশই ভালো।' সর্বোপরি, এমনই এক অরাজকতাহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আমি দেখি যেটা আর স্বপ্ন থাকবে না, হয়ে উঠবে স্বপ্নময় বাস্তব।

যারীন তাসনিম মুমু
শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

আমি এমন একটি দেশ কল্পনা করি যেখানে তরুণরা হবে শিল্প নির্ভর সৃজনশীল মননের অধিকারী। একটি স্বনির্ভর জাতি কল্পনা করি যাদের মাঝে জাত-পাতের কোনো বালাই থাকবে না। যেখানে প্রাণ এবং প্রকৃতি একসাথে সুন্দরভাবে বাঁচবে। ভবিষ্যতে আমি এমন একটি দেশকে কল্পনা করি যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ। সকল বৈষম্য দুর করে একটি বিশ্বমানের জাতি ও দেশ হিসেবে এগিয়ে যাব আমরা।

সুমাইয়া আমিন ঐশী
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ২য় বর্ষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ আমার অহংকার। এই দেশ নিয়ে শৈশব থেকেই আমার ভীষণ স্বপ্ন। আমি দেখতে চাই আমার লাল সবুজের বাংলাদেশে একদিন সকল স্বপ্নবাজ তরুণের সকল স্বপ্ন পূরণ হবে। বেকারত্বের ক্ষুধা একদিন নিঃশেষ হবে। অধিকার বঞ্চিত হবেনা কোনো তরুন, কোন নাগরীক। তরুণ উদ্দোক্তাদের মেধার আলোয় বিকশিত হবে আমার দেশ।

আবরার জাহীন পাটওয়ারী
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি চাই চিন্তাশীল তরুণ্য ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ। আমি এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, যেখানে তরুণরা কেবল চাকরিনির্ভর জীবনে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষা, গবেষণা ও সৃজনশীল চিন্তাকে জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে। তারা হবে কৌতুহলী ও অনুসন্ধানী, যারা তথ্য যাচাই করবে, যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করবে এবং ভিন্নমতকে সম্মান করবে। তাদের কাছে শিক্ষা শুধু ডিগ্রি অর্জনের বিষয় নয়; বরং নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার একটি সার্বিক প্রক্রিয়া হবে।

এই তরুণরা গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে সমাজের সমস্যার টেকসই সমাধান খুঁজবে। তারা পরিবেশ সচেতন হয়ে প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করবে এবং দলগত কাজ ও সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। এমন চিন্তাশীল ও গবেষণামুখী তরুণদের হাত ধরেই বাংলাদেশ একটি ন্যায়ভিত্তিক, জ্ঞাননির্ভর ও মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

জুয়াইরিয়া হোসেন
ইংরেজি বিভাগ, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

শিশু কিশোর পাতা

তরুপল্লব

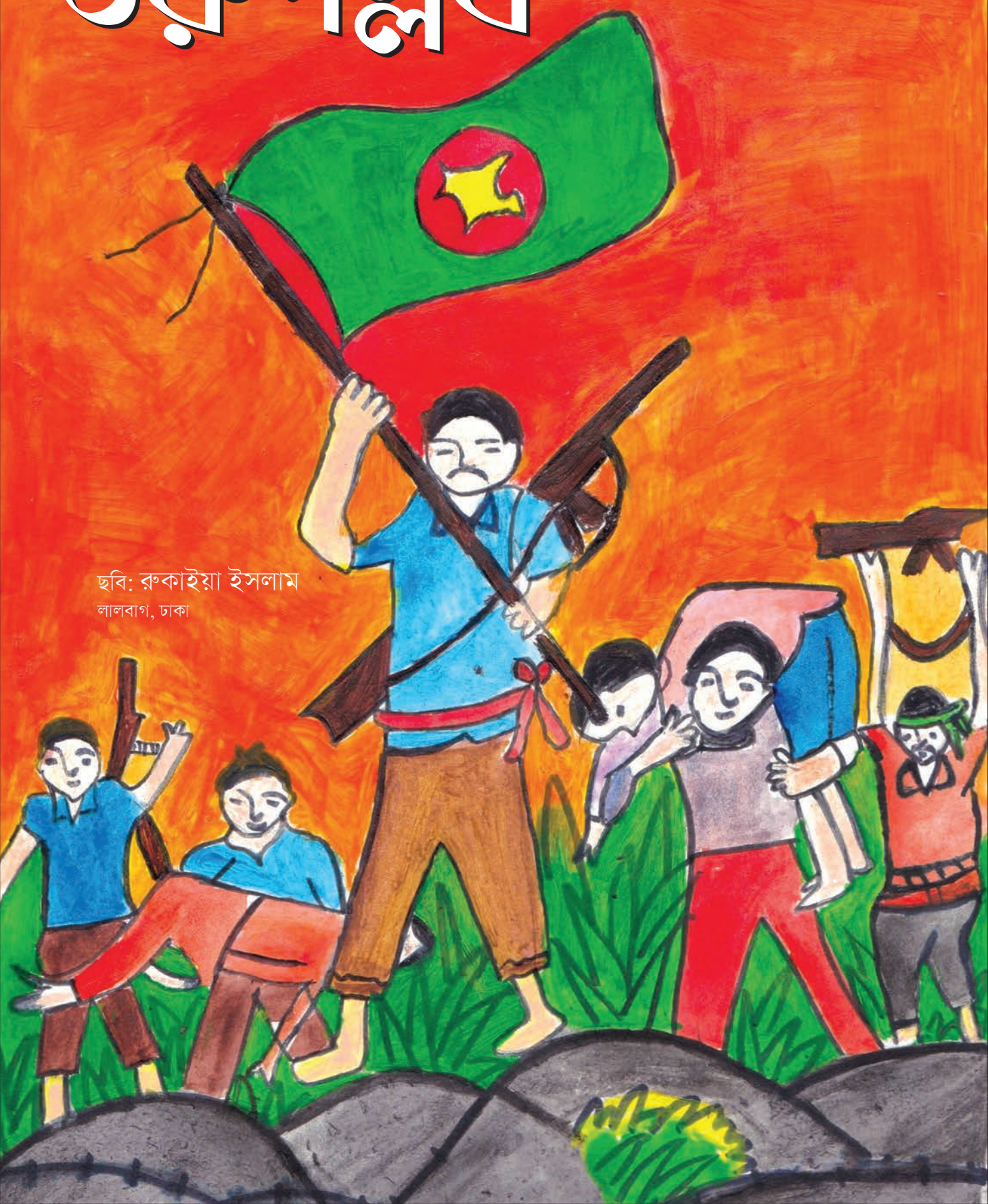

ছবি: রুকাইয়া ইসলাম
লালবাগ, ঢাকা

পতাকার মান

আবু তৈয়ব মুছা

রক্তে কেনা আমার এদেশ
কেউ করেনি দান,
জীবন দিয়েও রাখবো মোরা
এই পতাকার মান।

স্বাধীনতার অমর বাণী
মুক্তি নেশায় আনলো টানি
শ্মশান হলো জন্মভূমি
শহিদ কতো প্রাণ।

জন্মভূমির জন্য যাদের
একটুও নাই টান,
দেশের মানুষ নয়-শোনেনা
সোনার বাংলা গান।

রক্ত দিয়ে রাখলো যাঁরা
স্বাধীনতার মান,
এসো দেই তাঁদের তরে
সালাম ও সম্মান।

মায়ের ভাষা

কৃষ্ণ কর্মকার কৌশিক

মন কেড়ে নেয় মায়ের ভাষা
তার যে অনেক দাম
সারাবিশ্বে সবাই চিনে
বাংলা ভাষা নাম।
মায়ের ভাষা অতি খাসা
রক্তে মোদের বয়,
ভাষার মাঝে বাংলা সেরা
অন্য ভাষা নয়।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলো
বীর শহীদের দান,
ঢাকার পথে তাদের রক্তে
বয়ে ছিল বান।
ভাষার তরে শূন্য হলো
বাংলা মায়ের বুক,
স্মৃতিপটে আজও ভাসে
বীর শহীদের মুখ।
ফেব্রুয়ারির একুশ এলে
হয়নি কারো ভুল,
শহিদ মিনার যাই সকলে
হাতে নিয়ে ফুল।
স্মৃতির ধারা বিশ্ব মাঝে,
সবার বুকে রয়,
শহিদ স্মৃতি অমর রবে
কভু ভোলার নয়।

মাতৃভাষা

হাফিয রেদওয়ান

ছোট্ট শিশুর ফোকলা মুখে
বাংলা ভাষার বোল
মায়ের মুখে মুখ লাগিয়ে
বর্ণমালার দোল।

শোনতে ভীষণ ভালো লাগে
বাংলা ভাষায় গান
দামাল ছেলে যুদ্ধ করে
রাখে ভাষার মান।

খোকা খুকি ছড়া পাঠে
চিনবে শহিদ ভাই
বুকের তাজা রক্ত ক্ষয়ে
মাতৃভাষা পাই।

ষড়ঋতু

ইসতিয়াক আহমেদ তৌফিক

বাংলা ষড়ঋতুর দেশ
এখানে বৈচিত্রের নাইকো শেষ
গ্রীষ্মের পরেই বর্ষা আসে
পুকুরের শীতল জলে
হাঁসরা যায় ভেসে
শরতে সাদা ও নীল আকাশে
তুলার মতো মেঘ ভাসে
রাতের আকাশে জ্বল জ্বল করে
অজস্র তারার মেলা
তার নিচে বাংলার ছেলেরা
করে যায় খেলা
হেমন্তের নীল আকাশে
মাঠের উপর বসে
কেটে যায় বেলা
সোনার ধানে কৃষকের মুখে
ফোটে আনন্দের হাসি
সুখী রাখাল সারাবেলা
বাজিয়ে যায় বাঁশি
হেমন্তের পর শীত আসে
রুক্ষতার বেসে
সব ঋতুর শেষে
বসন্ত আসে
মধুর হাসি হেসে

ঈদ আনন্দ

শামীমা জান্নাত শিউলী

ঈদ আনন্দ ভুবন জুড়ে
খুশি লাগে প্রাণে,

আকাশ বাতাস মুখরিত
ঈদ আনন্দ ঘ্রাণে।

খোকা খুকি সবাই খুশি
নতুন জামা পেয়ে,
হাসি খুশিই ভরে ওঠে
ঈদ আনন্দ গেয়ে।

ঈদের দিনে ধনী গরিব
বিভেদ সবাই ভুলে,
জীবনটাকে সাজাও সবাই
রঙিন ফুলে ফুলে।

মহান রবের পক্ষ থেকে
আসে খুশির ঈদ,
তাই তো সবাই হেসে খেলে
গায় রে ঈদের গীত।

ছবি: হুমায়রা ইমরোজ
মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

টুনুর টেলিস্কোপ

জুয়েল আশরাফ

টুনুর বয়স আট। তার পুরো নাম তানজিম তাওহিদ। কিন্তু এ নাম সে নিজে শুনতেই পারে না। সে চায় সবাই তাকে ডাকুক টুনু বলে। কারণ সে মনে করে, টুনু নামে ডাকলে তার মাথায় বুদ্ধি আসে বেশি।

টুনুর বাবা সরকারি চাকরিজীবী, মা একজন স্কুল শিক্ষিকা। টুনু থাকে ঢাকার উত্তরার একটি পুরোনো দোতলা বাসায়। বাসার পেছনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানে একটা জামরুল গাছ আছে, আর আছে টুনুর গোপন ঘাঁটি। একটা লাল রঙের তাবু! ওই তাবুতে বসেই টুনু বড় হয়ে গবেষণা করে। সে বিজ্ঞানী হতে চায়। তবে আজকাল তার গবেষণার মূল বিষয় আকাশ।

টুনুর মাথায় এখন শুধু একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়- 'তারা কি মানুষকে দেখে? তারা কি কথা বলে? তারা কি একা একা আকাশে ঝুলে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না?' এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সে একদিন তার জন্মদিনে আবদার করে বসল, 'আমি একটা টেলিস্কোপ চাই!'

বাবা-মা তো হতভম্ব। একটা সাধারণ খেলনা না চেয়ে টেলিস্কোপ? মা বললেন, 'ওটা দিয়ে কী করবি?'

'আমি রাতের আকাশে তারা গুনব,' গম্ভীর গলায় বলল টুনু, 'আর যদি কোনো তারা কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যায়, তাহলে তাকে শান্ত্বনা দেব।'

অবশেষে জন্মদিনে উপহার এল এক পুরোনো ধাঁচের কালো রঙের টেলিস্কোপ। বাবা জোগাড় করেছেন পুরান বইয়ের দোকানের পাশের এক পাগলাটে দাদুর কাছ থেকে। সেই দাদু নাকি এককালে রাত জেগে তারা দেখতেন। এখন চোখে ভালো দেখে না, তাই টেলিস্কোপটা বিক্রি করে দিয়েছেন। টুনু টেলিস্কোপ পেয়ে খুশিতে লাফিয়ে উঠল। সেই দিন থেকেই শুরু হলো তার তারা-পর্যবেক্ষণ।

টেলিস্কোপ কাঁধে করে তুলে সে উঠে যায় ছাদে, তারপর তাকিয়ে থাকে তারা ভরা আকাশে।

প্রথম কয়েকদিন সব স্বাভাবিক ছিল। তবে একদিন রাতে হঠাৎ করে টেলিস্কোপে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেল টুনু। একটা ছোট তারা মিটমিট করে কাঁপছে! আর আশেপাশের তারা যেন তাকে এড়িয়ে চলছে! টুনু অবাক হয়ে গেল।

পরদিন রাতেও সে আবার তাকাল। তারা কাঁদছে! টুনু শপথ করে ফেলল, এই তারা-আপার চোখের জল সে মুছিয়ে ছাড়বে। রাত বাড়তেই, হঠাৎ টেলিস্কোপের লেন্সে ঝিকঝিক করে একটা আলো জ্বলে উঠল। টুনু চোখ কচলে দেখে, তারার মতো দেখতে একটা ছোট্ট মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলছে, 'আমার নাম জিরা। আমি সপ্তর্ষির এক তারা। আমাকে সবাই ভুল বুঝেছে। তুমি কি আমার বন্ধু হবে?'

টুনু তো একেবারে থ! তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'তুমি তারা হয়ে কথা বলো কী করে?'

জিরা হেসে বলল, ‘এই টেলিস্কোপটা যিনি বানিয়েছেন, তিনি শুধু তারা দেখার যন্ত্র নয়, তারা বোঝার ভাষাও জুড়ে দিয়েছেন এতে। এটা আসলে মনস্কোপ!’

এরপর থেকে টুনুর রাতগুলো হয়ে উঠল রোমাঞ্চে ভরা। সে প্রতিদিন কথা বলে জিরার সঙ্গে। তারা একসঙ্গে তারা-জগত ঘুরে বেড়ায়। শনি গ্রহের বলয়, ধূমকেতুর লেজ, মহাকাশ স্টেশন, এমনকি একবার এক অদ্ভুত রংধনু গ্রহেও ঘুরে এল! তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ দিনটি এল ঈদের আগের রাতে।

সেদিন হঠাৎ টুনু টেলিস্কোপে দেখতে পেল, পৃথিবীর এক কোণায় একটা ছোট বাচ্চা ছেলেকে। তার নাম লিয়ন। গায়ে ভালো জামা নেই, ঈদের দিনে সে একা বসে আছে একটা রেলস্টেশনের বেঞ্চে। তার চোখেও জল। জিরা বলল, ‘তুমি যদি চাও, আজ তাকে নিয়ে আসা যাবে তোমার ঈদের ঘরে।’

টুনু অবাক হয়ে বলল, ‘সত্যি? কীভাবে?’

‘তোমার ইচ্ছে যদি সৎ হয়, মনস্কোপ সেটা বুঝবে,’ বলল জিরা।

টুনু মনস্কোপের লেন্সে চোখ রেখে বলল, ‘আমি চাই লিয়ন আমার সঙ্গে ঈদ করুক। আমি আমার সেমাই, কাবাব, নতুন জামা, সব ভাগ করে দেব!’

তক্ষুনি টেলিস্কোপের ভেতরে একঝলক আলোর বিস্ফোরণ, আর তারপর... টুনু দেখল তার খাটের পাশে একটা ছোট ছেলে ঘুমাচ্ছে। পরনে নতুন পাঞ্জাবি, পাশে রাখা ঈদের টুপি আর এক প্লেট সেমাই।

সকালে মা-বাবা হকচকিয়ে গেলেন। ‘এই ছেলে কে?’ টুনু জবাব দিল, ‘এ আমার ঈদের বন্ধু। ওর নাম লিয়ন। ঈদের খুশি তো সবার হওয়া উচিত, তাই না?’

ঈদের দিন বিকেলে টুনু আর লিয়ন মিলে বাগানে টেবিল পেতে বসেছে। ছোট্ট টেবিলে সেমাই, ফিরনি, রোস্ট, আর একটি ছোট্ট টেলিস্কোপ। আরেক পাশে হালকা নীল গালে লাল তারা আঁকা জামা পরা এক মেয়ে হেসে দাঁড়িয়ে আছে, সে শুধু টুনুই দেখতে পায়। সে নামিয়ে আনে এক ফোঁটা জ্যোৎস্না।

বলে, ‘এই ঈদে শুধু পশু নয়, তোমার মনটাও কুরবানি করেছো। সেটা তারা থেকেও দেখা যায়।’

চাঁদের আলোয় তখন টুনু, লিয়ন, আর একটি অদ্ভুত ছায়াময় তারা একসঙ্গে হাসে। আকাশের সব তারা তখন একযোগে হাসতে থাকে যেন বলছে, ‘পৃথিবীর এই ছোট্ট ছেলেটা আজ তারার মতো জ্বলে উঠেছে!’

ভাষার দাবি

নাজীর হুসাইন খান

ফেব্রুয়ারি মাসটি এলে
স্মরণ করি কাদের?
ভাষার দাবির আন্দোলনে
প্রাণ গিয়েছে যাদের।

সালাম বরকত রফিক জব্বার
শফিউর রহমান
তাদের নিয়ে গায়ছে কে রে?
ফেব্রুয়ারির গান।

ফেব্রুয়ারির গানটি শুনে
স্মরণ হলো তাদের
ভাষার দাবির আন্দোলনে
জীবন গেলো যাদের।

দাদুর পতাকা

শাকিব হুসাইন

রাত দশটা। দাদু সদ্যই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। দাদুর তারাতাড়ি ঘুমানোর কথা। আজকে একটু দেরি করে ফেলেছে। সে যাকগে, আমার মিশন আজকে সফল করতেই হবে।

কীসের মিশন? পাঠকসমাজকে অবগত করছি শেষমেশ।

মিশনটা হচ্ছে এই যে, দাদুর ঘরে একটা আলমিরা আছে। পুরাতন কিন্তু সোনালী রঙের আলমিরাটার সৌন্দর্যটা এখনও মোনালিসার মতো উজ্জ্বল। বাসার সবাই আলমিরাটা অনেকবার খুলতে গিয়েছিল কিন্তু কেউ সফল হতে পারে নি। সবার ধারণা আলমিরার ভিতরে কোন মহামূল্যবান কিছু একটা আছে। তাই আজকে চুপিচুপি আলমিরাটার কাছে গিয়ে যেই খুলতে যাব অমনি পিছন থেকে দাদু বলে উঠলেন, রনি আমি এখনো জেগে আছি রে। আলমিরা খোলার বৃথা চেষ্টা করিস না।

যা বাব্বাহ্, আমিও ধরা খেয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে দাদুর কাছে গেলাম। দাদু পাশে বসতে বললেন। আর বললেন, ওই আলমিরা তোরা খোলার চেষ্টা করলেও খুলতে পারবি না। ওই আলমিরার কাছে কেউ গেলেই যে আমার মনের মাঝে তোলপাড় চলে রে দাদুভাই। মনে হয় আমার এতো দিনের আগলে রাখা সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি দাদুকে স্নেহজরা কণ্ঠে বলি, দাদু ওই আলমিরাটায় কি এমন মহামূল্যবান বস্তু আছে বলো তো?

দাদু একটু রাগান্বিত ভঙ্গিতে বললেন, শুধুই মহামূল্যবান না রে। আমার দেশটা আছে ওখানে। ওই আলমিরাতে আমার পুরো দেশটা চোখ বুঝে ঘুমোচ্ছে রে দাদুভাই।

দাদু আর কিছু বললেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন তক্ষুনি। আমিও আর কোনদিন আলমিরার ধারের কাছেও যাই নি।

আজ ২৫শে মার্চ। রাতে যখন খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমিয়েছে তখন দাদুর তলব পড়ল রফিক ভাইয়ের মারফতে। দাদুর কাছে গিয়ে বসতেই দাদু বললেন, আজকে তোকে একটা গল্প শোনাব। শুনবি তো?

আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। দাদুর আজকে হঠাৎ কী হলো?

আমিও চটজলদি বলে উঠি, অবশ্যই শুনব দাদু।

দাদু গল্প বলা শুরু করলেন রূপকথার মতো,

তখন ১৯৭১ সাল। এদেশের বুকে নেমে এলো ঘোর কালোরাত। ২৫ মার্চ গভীর রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালাল। গ্রাম-গঞ্জও রেহাই পেল না। শহরের পাশাপাশি গ্রাম-গঞ্জেও নির্বিচারে গণহত্যা চালাতে লাগল। শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জও সারাদেশে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠল। স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ গণযুদ্ধে পরিণত হয়ে উঠল।

'তারপর কী হলো দাদু?'

'শোন কী হলো, আমরা কয়েকজন ভারতে গেলাম ট্রেনিং নিতে।

আমাদের বয়স তখন সবেমাত্র পনেরো কী ষোলো হবে। সেই বয়সে আমরা চুপ থাকতে পারিনি। মাথা গরম তো। দেশের মানুষকে খুন করলে রক্ত বিগড়ে যায়। ট্রেনিং থেকে এসে দমাদম মিলিটারি মারতে লাগলাম। অবশেষে দীর্ঘ ন'মাস লড়াই করে ত্রিশ লক্ষ শহিদ, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম আর নাম না জানা অসংখ্য শহিদের বিনিময়ে পেলাম স্বাধীন এই দেশ। বাংলাদেশ! পেলাম লাল-সবুজের পতাকা। আমার দেশের পতাকা। শহীদের রক্তের পতাকা। আকাশে তখন পতপত করে উড়ছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকা।

আচ্ছা যা, আলমিরাটা খোল।'

আমি তো রীতিমতো অবাক। হঠাৎ দাদু আলমিরা খুলতে বলছেন। তা-ও আবার আমাকে। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

আলমিরা খুলতেই একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকে ভেসে উঠল। অনেক দিনের পুরনো তো। এই তো আলমিরার ভেতরে লাল সবুজের মানচিত্র খচিত পতাকা। এর বাইরে আলমিরাতে আর কিছুই নেই। দাদুর কাছে নিয়ে যেতেই বললেন, এই জিনিসই আমার মহামূল্যবান বস্তু রে দাদুভাই। এই পতাকাই আমার স্বাধীন বাংলাদেশ। জানিস দাদুভাই, এই পতাকা গায়ে জড়িয়ে আমি যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীনের পর এই পতাকা উড়িয়েছি দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। আজ থেকে এই দুটো তোর। আগলে রাখিস দাদুভাই আমার দেশকে। আমার পতাকাকে।

আমি দাদুকে কথা দিই জীবনের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করব দাদুর পতাকা। ঘড়ির কাঁটায় রাত ১২ টা বেজে ১ মিনিট। দাদু ঘুমিয়ে গেলেন। সেই যে ঘুমালেন আর উঠলেন না। চলে গেলেন তাঁর লাখো শহিদ ভাইদের কাছে। আলমিরাটা এখন আমার ঘরে থাকে। দাদুর পতাকা এখনও আলমিরাতে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকে...

একুশ মানে

কাজল নিশি

একুশ মানে স্মৃতি কথা
বোনের চোখের জল -
একুশ মানে বাংলা ভাষা
বিশ্বে সমুজ্জ্বল।

একুশ মানে ময়ের ভাষা
বাবার মুখের হাসি-
একুশ মানে হৃদয় রাজ্যে
বাংলা ভালোবাসি।

একুশ মানে বিশ্বমাঝে
ভাষার জন্য লড়াই -
একুশ মানে শহিদ বেদী
পদ্মা, মেঘনা, গড়াই।

একুশ মানে সালাম, রফিক
ভয় করেনি ভয় -
মৃত্যুকে তাই মুঠোয় করে
আনল ভাষার জয়।

স্বাধীনতা

এম. আলমগীর হোসেন

স্বাধীন স্বাধীন তিনবার স্বাধীন
হয়েছে এ দেশটা,
সবাই মিলে শপথ নিলে
রক্ষা হবে শেষটা।

সাতচল্লিশ আর একাত্তরে
দেশ হয়েছে ভাগ,
চব্বিশ এলো ধ্বংস হলো
আধিপত্যবাদ।

ধনী গরিব উচু নিচু
বর্ণভেদের রেশটা,
এই সমাজে কথায় কাজে
এখনো পাই বেশটা।

রুখতে সবে জাগতে হবে
করলে খানিক চেষ্টা,
উঠবে গড়ে সবার চাওয়া
বৈষম্যহীন দেশটা।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ ● ০৮ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফএম ১০২ মেগাহার্জ)

রাত

১২-৩০ একুশের গল্প: নাটক
মূল রচনা: জহির রায়হান, বেতার নাট্যরুপ: ফজলুল করিম
প্রযোজনা: দিলওয়ার হোসেন (পুন: প্রচার)

২-০০ প্রাণের একুশ অমর একুশ: বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: মো. শফিউদ্দিন শিকদার
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মো. ইসহাক
প্রযোজনা: মো. মনিরুজ্জামান (পুন: প্রচার)

২-৩০ অজেয় বর্ণমালা: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মনিরুজ্জামান পলাশ
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা (পুন: প্রচার)

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ (এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ)

সকাল

৮-১৫ পলাশ রাঙা একুশ: মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

৮-৩০ গৌরবের একুশ: গান, কবিতা, নিবন্ধ, কথিকা নিয়ে দর্পণ
ম্যাগাজিনের বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নুসরাত হাবিব
উপস্থাপনা: শাহীনুর রহমান ও রওনক জাহান
প্রযোজনা: মো. দেলোয়ার হোসেন

৯-০৫ গৌরবময় ভাষা আন্দোলন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ড. মোহাম্মদ আজম, ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
সঞ্চালনে: শারমিন রহমান
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৯-৩০ বর্ণমালার গল্প: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: তাপসী মুনীর
উপস্থাপনা: সমৃদ্ধি সূচনা ও মো. জাফির হাসান
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

১০-০৫ একুশের পংক্তিমালা: স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: মো. বাকের মাহমুদ

১০-২০ শ্বাশত একুশ: বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: মহম্মদ সাজিদ মাহমুদ (প্রামানিক)
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: আলী আশরাফ
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম রনি ও সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু ও মো. মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকীয় ও বিশেষ ক্রোড়পত্র পাঠের অনুষ্ঠান: প্রাসঙ্গিক কথা
অংশগ্রহণে: শাহনাজ পারভীন, মীর নাসির আহমেদ নিউটন, মো. জামিলুর রহমান
সঞ্চালনে: ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: মো. বাকের মাহমুদ

১-৩০ তারুণ্যের স্বপ্নে বাংলাদেশ: ক্যাম্পাসভিত্তিক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ
প্রযোজনা: মো. আশরাফুল ইসলাম

২-২০ নারীকণ্ঠ: নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

বিকাল

৪-২৫ একুশের কবিতা: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মনিরুজ্জামান পলাশ
প্রযোজনা: কাজী নৌরীন ইসলাম

৪-৪৫ সবুজ পৃথিবী: জলবায়ু, পরিবেশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গবেষণা ও গ্রন্থনা: জেবুন্নেসা মুনিয়া
উপস্থাপনা: জেবুন্নেসা মুনিয়া ও নিশাত শাহরিয়ার
প্রযোজনা: মো. বাকের মাহমুদ

রাত

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: বিশেষ সংবাদ প্রবাহ
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. দুলাল হোসাইন

১০-০০ সমান্তরাল: বিশেষ নাটক
রচনা: এডভোকেট শাহজাহান কবীর
প্রযোজনা: আলেয়া ফেরদৌসী

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

৮-১৫ আলোকপাত: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজনীন আক্তার রেখা
সাক্ষাতকার: বাঙ্গালি জাতিসত্তার প্রতীক ভাষা আন্দোলন:
অধ্যাপক মো. কামরুল আলম চৌধুরী
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

৮-৪৫ একুশের কথা: মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জনাব নাজনীন হক
কথিকা: প্রমিত বাংলা ভাষার উচ্চারণ ও ব্যবহার:
ড. মো. ইলিয়াস
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৯-২০ মধুর আমার মায়ের ভাষা:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: কামরুন্নাহার
শিশু উপস্থাপক: পৃথ্বী নন্দিনী ও আদিলা চৌধুরী
প্রযোজনা: জ্যোতির্ময় গোলদার

১০-০৫ রক্তে রাঙা ভাষার পথ: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এস আনিস আহম্মেদ বাচ্চু
উপস্থাপনা: সেঁজুতি বড়ুয়া
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১০-৩০ আমার বর্ণমালা: তরুণদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: স্বাগতা বড়ুয়া নদী
প্রযোজনা: মো. নাঈম সিদ্দিকী

বেলা

১১-০৫ স্মৃতির মিনার: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জেবুন নাহার শারমিন
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত: বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: মো. নাঈম সিদ্দিকী

৩-৩০ রক্তে রাঙা পলাশ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মো. ওবায়দুল্লাহ
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: পাপিয়া আহম্মেদ
উপস্থাপনা: সেঁজুতি দে
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

রাত

৯-১০ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
বহিঃপ্রচার ধারণে ও সম্পাদনা: সুনপ তালুকদার
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

১০-০০ চেতনায় একুশ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. আনোয়ারা বেগম
অংশগ্রহণ: ড. মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম,
প্রফেসর মো. আবুল হাসান
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-৩০ পলাশ ফোটার দিন: বিশেষ নাটক
রচনা: অশোক কুমার চৌধুরী
প্রযোজনা: মো. মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

সকাল

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: এস এম তিতুমীর
প্রযোজনা: মো. মাসুম পারভেজ

৮-৪৫ মাসব্যাপী অনুষ্ঠান
গবেষণা গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুরজাহান বেগম
ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য:
মুহাম্মদ সাজ্জাদুর রহীম
খ. ভাষার কবিতা আবৃত্তি (একুশে ফেব্রুয়ারি):
এস এম মোস্তাফিজুর রহমান
গ. ভাষার গান: মাঝে মাঝে মাঝ রাতে: পারমিতা হক কংকন
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

৯-০৫ আমার ভাষা আমার গর্ব:
শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জাহিন বিশ্বাস এষা
রচনা ও পাঠ: রাজীব হুমায়ুন খান
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-৪৫ পঙ্ক্তিমালায় একুশ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহমুদ হাসান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-০০ অহংকারের বর্ণমালা: গীতিনক্শা
রচনা: সোহেল রানা
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: মাকসুমুল হুদা
ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন (পুন:প্রচার)

বেলা

১১-০০ সম্পাদকীয় মতামত:
বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. শাহজাহান আলী
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

১১-৩০ বাক স্বাধীনতা ও ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আবরার শাইর
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক আব্দুল খালেক এবং
অধ্যাপক ড. মাসউদুল ইসলাম খান
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

দুপুর

১২-১৫ পলাশ ফোঁটার দিনগুলো: গীতিনকশা
রচনা: নাহাফুজা খাতুন
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
বর্ণনা: বিলকিস বেগম
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

৩-০৫ কবর: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে নাটক
রচনা: মুনির চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা:
আবু মো. জহিরুল আলম বুলবুল

রাত

৯-২০ সংবাদ বিচিত্রা: রাজশাহী বেতার অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও বহি: ধারণে: মো. ফেরদৌস উর রহমান
উপস্থাপনা: ফারজানা ইয়াসমিন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

৯-৩০ মায়ের বুলি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: মো: শাহেদুল ইসলাম
উপস্থাপনা: তাসনীম সুবাহ
সুর ও সঙ্গীত: আহসান হাবীব
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

১০-৩০ আমরি বাংলা ভাষা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদ-উল ইসলাম
উপস্থাপনা: কে এম লুৎফুল কবীর পান্না ও
নাসিমা চৌধুরী লিপি
সুর ও সঙ্গীত: চম্পক কুমার
প্রযোজনা: সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান

বেলা

১১-৩০ স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামতের
পর্যালোনামূলক অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: ইউসুফ খন্দকার
পর্যালোচনা: মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

৩-০৫ পলাশ রাঙা ফাগুন: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রফিকুল ইসলাম রইস
উপস্থাপনা: শেখ ফরিদ অভি ও খাদিজা জাফরিন
সুর ও সঙ্গীত: চম্পক কুমার
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

বিকাল

৫-১০ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ ও মাতৃভাষার অধিকার:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য
অংশগ্রহণ: আতাহার আলী খান, খাইরুল হাবিব
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

রাত

৯-০৫ রংপুর অঞ্চলের আশে-পাশে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তিকরে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: শাম্মী হক

১০-৩০ ছড়াও ফুলের বন্যা: স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আনোয়ারুল ইসলাম রাজু
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

৯-১০ প্রভাতফেরি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবস ভিত্তিক আলোচনা: উপস্থাপক
খ. মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস:
শিশুতোষ আলোচনা: মুন্সি ইকবাল
গ. শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে আসর ভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিচালনা: জ্যোতি ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

১০-৩০ বাঙালীর প্রেরণার উৎস ভাষা আন্দোলন:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা, অধ্যাপক আঞ্জুমান আরা বেগম, অধ্যাপক আব্দুল বাছিত খান
সঞ্চালনা: সালেহ আহমেদ
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

বেলা

১১-০৫ ভাষার জন্য লড়াই: স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: সালেহ আহমদ খসরু
প্রযোজনা: মো. ইকবাল হোসাইন

১১-৩০ আমরি বাংলা ভাষা: একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মুহিত চৌধুরী, উপস্থাপনা: সায়মা সুলতানা
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-১০ শিশির ভেজা একুশ: একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আনোয়ার হোসেন রনি
উপস্থাপনা: জিল্লুর রহমান জয়
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

বেলা

১-৩০ চেতনায় একুশ: ভাষার গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কুমকুম হাজেরা মারুফা
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

২-০৫ স্মৃতির মিনার: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
প্রযোজনা: মো. ইকবাল হোসাইন

৩-৩০ রক্তে গড়া শহীদ মিনার:
সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আব্দুস সবুর মাখন
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধারাবর্ণনা: শামীমা আক্তার
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

বিকাল

৪-৩৫ প্রজন্মের ভাবনায় একুশ: তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উস্থাপনা: চৌধুরী হিজবুল জান্নাত
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

রাত

১০-০০ কবর: বিশেষ নাটক
মূল রচনা: মুনীর চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ: সুদীপ চৌধুরী
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-৪৫ অমর একুশে: মাসব্যাপী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জাহিদ হোসেন
ক. প্রসঙ্গ কথা: ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি: উপস্থাপক
খ. বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: অরুপ তালুকদার, ভাষা সৈনিক
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-২০ মধুর আমার মায়ের ভাষা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মৌমিতা বিনতে মিজান
বর্ণনা: জান্নাতুল প্রীতি
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৪৫ একুশের পংক্তিমালা: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মুহা. গোলাম মোস্তফা
অংশগ্রহণ: রতন দাস বাপ্পী, শাহনুর খানম
প্রযোজনা : হাসনাইন ইমতিয়াজ

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

২-৩০ রক্তে গাথা বর্ণমালা: গীতিনকশা
রচনা: ড. গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস
সুর ও সংগীত পরিচালনা: সজীব আহমেদ
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

বিকাল

৪-০৫ গর্বের একুশ প্রাণের একুশ: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মো: আলাউদ্দিন
অংশগ্রহণ: প্রফেসর সোহরাব হোসেন হাওলাদার, মোহসিনা হোসাইন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

১০-৩০ বরিশাল ও এর আশে-পাশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুছা
বহিঃধারণ: মো. মেজবাহ
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

মধ্যম তরঙ্গ ৩০০.৩০ মিটার ব্যান্ড ৯৯৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ

সকাল

৮-৩০ কবিতায় অমর একুশ: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারহানা ইসলাম কলি
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

৯-২০ একুশের আলোয়:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: লাইলী বেগম, উপস্থাপনা: সাবরিনা ফারিন অথৈ
সংগীত পরিচালনা: মো. শহিদুল ইসলাম
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

১০-৩০ চেতনার ছন্দে একুশ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদুন্নবী প্রধান
ধারাবর্ণনা: তানিয়া আক্তার ও আলমগীর ইসলাম
সুর ও সংগীত পরিচালনা: তুষার কান্তি বর্ধন
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

২-১০ একুশের গল্প: বিশেষ নাটক
মুল কাহিনী: জহির রায়হান
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

বিকাল

৪-৩০ বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মো. আখতার হোসেন
অংশগ্রহণ: জান্নাতুন নাহার, মনিশংকর দাশ গুপ্ত
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

গন্ধ্যা

৬-১০ জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় পর্যালোচনা
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আতিয়ার রহমান
অংশগ্রহণ: এস এম জসিম উদ্দিন
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

৬-২৫ বেতার বিবরণী: ঠাকুরগাঁও এবং এর আশেপাশে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

৬-৪০ অমর একুশে: মাসব্যাপী বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: উম্মে সালমা রিপা
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

(এ এম-১১৬১কিলোহার্জ ও এফ এম-১০৩.২হার্জে একযোগে)

সকাল

৮-১০ মায়ের ভাষার গান: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রাখাল চন্দ্র দাশ
ধারাবর্ণনা: চৈতি ঘোষ ও মো. রেজাউর রশিদ পাপ্পু
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: রনেশ্বর বড়ুয়া
নির্দেশনা: মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৪০ প্রাণের বর্ণমালা: স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ,ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও সঞ্চালনা: মো. মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-১০ একুশ আমার অহংকার: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আনোয়ারুল হক
অংশগ্রহণে: ড. মো. মিজানুর রহমার,
অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসিমুল হক, শিরিন পারভীন
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

২-৩৫ বর্ণমালা: শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: কথা চাকমা
গ্রন্থনা ও গীত রচনা: হাসান মাহমুদ মঞ্জু
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: আলী হোসেন চৌধুরী
প্রযোজনা: মো. সায়েফ আল হাসিব

৩-৩৫ ভাষা আন্দোলনে নারী:
মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান পরিচালনা: শিখা ত্রিপুরা
ক. দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
খ. কবি ও কবিতায় একুশ বিষয়ক সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান: কবি সুকৃতি ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

বিকাল

৫-২০ বেতার বিবরণী: রাঙামাটি অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরনী
ধারণ: পম্পি বড়ুয়া
প্রযোজনা: মো. সায়েফ আল হাসিব

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

দুপুর

১২-১০ বাংলা আমার মাতৃভাষা:
যুবসমাজের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আফিফা ইয়াসের উলফা
প্রযোজনায়: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বেলা

১-৩০ ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কে এম সানাউল হক
অংশগ্রহণ: ফালগুনী দাশ, আশুতোষ রুদ্র, তাপস বড়ুয়া
প্রযোজনা: মোহাম্মদ আশরাফ কবির

২-৩৫ একুশের চেতনায় বাংলাদেশ: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: নুরুল ইসলাম, অংশগ্রহণে: অজিত দাশ,
এহছান উদ্দিন
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-০৫ আল্পনা আঁকি রাজপথ জুড়ে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শাহীন আকতার
সুর সংযোজনা: বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: রথিন পাল ও পূর্ণিতা বড়ুয়া পূজা
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-৩৫ ভাষার মানচিত্রে নারী: নারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রচয়িতা পাল রেশমী
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৭-৩০ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:
একুশের গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মেখ্যাইউ মারমা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৮-৩০ প্রিয় বর্ণমালা:
শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বান্দরবান
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

২য় অধিবেশন

বেলা

২-৪০ কবিতায় একুশ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হোসনে আরা খানম
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

৩-১০ রক্তে ফোটা বর্ণমালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: সৈয়দুল হক
ধারাবর্ণনায়: নেসার আহমেদ জাকির, নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৪০ মায়ের ভাষায় কথা বলি:
যুব সমাজের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: সামিয়া জান্নাত পুতুল, খালেদ বিন নজরুল,
মো. শাহাদাত হোসেন
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুসরাত জাহান শাম্মী

বিকাল

৪-১০ ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক ওসমান গণি, মো. জাহাঙ্গীর আলম,
ফেরদৌস হায়দার রুসো
সঞ্চালনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

৪-৩৫ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ: আল মামুন
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

সকাল

৮-১০ একুশের গান গাই: ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাসান

৯-১০ ৫২'র ভাষা আন্দোলন-কুমিল্লা প্রেক্ষিত:
সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান: আবুল হাসানাত বাবুল
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: মো. ইমরান হোসেন

৯-৩৫ একুশের অমর গান: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সোহানা শারমিন রাকা
প্রযোজনা: মো. ইমরান হোসেন

বেলা

২-৩০ আমার বর্ণমালা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মেহেনাজ চৌধুরী
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৩-০৫ একুশের কথা: বিশেষ নাটক
রচনা: বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির উল আনোয়ার
প্রযোজনা: সৈয়দ মো. বিলাল উদ্দিন

৩-৩০ কবিতায় একুশ: বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বিকাল

৫-১০ নারীর কণ্ঠে একুশ:
নারী সমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাজিয়া ইয়াসমীন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৫-৩৫ ইসলামে শহীদের মর্যাদা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া
পরিচালনায়: মাওলানা হাবিবুর রহমান আল ফরিদী
অংশগ্রহণ: মাওলানা শাহজালাল সিরাজী,
মাওলানা মনিরুল ইসলাম ও মাওলানা মোশাররফ হোসাইন
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

সন্ধ্যা

৬-০৫ একুশের গান: বিশেষ গীতিনক্সা
রচনা: গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, সুরকার: মো. রুহেল খন্দকার
প্রযোজনা: মো. ইমরান হোসেন

৬-৩৫ কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার উপর ভিত্তি করে
একটি বেতার বিবরণী
প্রামাণ্য ধারণ ও উপস্থাপনা: মো. শাহজালাল
প্রযোজনা: মো. ইমরান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফ.এম ৯২.০ মেগাহার্জ

সকাল

৮-১৫ একুশ আমার অহংকার: গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শরিফা রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-০৫ মোদের গরব মোদের আশা আম-রি বাংলা ভাষা
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুকাইয়া ইসলাম
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

বেলা

২-৩০ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব:
বিশেষ আলোচনা
সঞ্চালনায়: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর,
অধ্যাপক ড. মো. সোহেল হাসান,
প্রফেসর শাহ মো. ইকবাল হোসেন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-০৫ কবর: নাটক
রচনা: মুনীর চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ: অশোক কুমার বিশ্বাস
শব্দ সংযোজনা: খন্দকার সাদমান সাকিফ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-৩৫ বাংলা আমার প্রাণের সুর: গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মৌসুমী আক্তার
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

বিকাল

৪-৪০ একুশের পঙক্তিমালা: বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৫-৪০ বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা: মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-২০ রক্তে রাঙা একুশ: ভাষার গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাতুল ইসলাম নির্জন
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

৯-১০ আ-মরি বর্ণমালা: কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: স্বর্না চাকলাদার
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

২য় অধিবেশন

বিকাল

৩-০৫ হ্যালো মাইমেনসিং (বিশেষ পর্ব):
শো বেজড লাইভ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ডকুমেন্টারি: একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিতব্য একুশে
ফেব্রুয়ারির বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাশরিকি খান মাহিন ও কথা আক্তার
প্রযোজনা: মো. রবিউল আউয়াল মারুফ

সন্ধ্যা

৬-১০ রক্তে রাঙা একুশ: ভাষার গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাতুল ইসলাম নির্জন
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
ক. মহান শহীদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. ভাষার গান: আমার ভাইয়ের রক্তে: সমবেত কণ্ঠে
সাক্ষাৎকার প্রদান: ডা: নুজহাত-ই রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহন: ডা: ডরিন আঞ্জুম
সম্পাদনা: মো: আকবর হোসেন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. ভাষার গান: গল্প আমার ফুরায় না: রোকেয়া সিদ্দিকা
কথা: আবিদ আনোয়ার, সুর: অনুপ ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. একুশের গান: আমার মায়ের কথা শুনে: তানজিনা করিম স্বরলিপি
কথা: মো: ফখরুল করিম, সুর: বিশ্বজিত সরকার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-০৫ স্মৃতির মিনার: মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফাতেমা জেবুন্নেসা মুনিয়া
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৯-৩০ এখনও রক্তের রং ভোরের আকাশে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: হীরেন্দ্রনাথ মৃধা
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: আব্দুল্লাহ খান
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকাল

৩-০০ মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা: তানিয়া সুলতানা ও জোবায়েদ হোসেন পলাশ
কথিকা: বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন:
অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

৪-৩০ একুশের অমর ধ্বনি:
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মো. আমিনুল ইসলাম
উপস্থাপনা: শারমিন রহমান আজমী ও মো. আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: এস কে মিতা খানম

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর

রাত ১-৪০ ও রাত ১০-৪০
পলাশ রাঙা একুশ
ভাষা আন্দোলন ও ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. মঞ্জুরুল হক
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

External Service
6-30 PM & 7-00 PM
English 1st Transmission
My Language, My Identity
a. Intro on International Mother Language Day
b. Song: Moder gorob moder asha a mori Bangla bhasha
মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা
Singer: Mita Haque
Lyric and Tune: Atul Prasad Sen
c. Talk: Celebration of International Mother Language Day worldwide
By: Professor Ahmed Reza
d. Recitation of Poem Shei Falgun Amor Ekushey
সেই ফালগুন অমর একুশে
Poet: Faruk Nawaz
Recited by: Farhana Parveen Hoque
e. Song: Ami Banglay gaan gai ami Banglar gaan gai
আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই
Singer: Mahmuduzzaman Babu.
Lyric and Tune: Pratul Mukhopadhyay
Compiled by: Munshi Rafiqul Islam
Presented by: Taslima Omar
Produced by: Umma Farhana Hossain Shimu

External Service
11-45 PM & 1-00 AM English 2nd Transmission
Special Talk on the Occasion of
International Mother Language Day 2026
Arabic, Hindi and Nepali Services
Subject: Celebration of
International Mother Language Day Worldwide
Written By: Professor Ahmed Reza
Translated By: Scheduled Artist of Arabic, Hindi and Nepali Services.

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার: কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান
আমার বাংলা: আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে
ফেব্রুয়ারি: সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তানিয়া সুলতানা
প্রযোজনা: মৃন্ময় মন্ডল তুষার

বিকাল

৫-৫০ সবুজ প্রান্তর: পরিবেশ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ইফতেখার আলম
প্রযোজনা: মৃন্ময় মন্ডল তুষার

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান:
কিষাণ বধূ গ্রামীণ মা বোনদের অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
বিশেষ সাক্ষাৎকার: মাতৃভাষা গৌরবের ভাষা
সাক্ষাৎকার প্রদান: তারিক মনজুর
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা: আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: বাংলা ভাষার বিশ্বযাত্রা:
কথক: মো. আজহারুল আমিন
আসর পরিচালনা: লিয়াকত আলী খান
অংশগ্রহণে: শাহজাদী বেগম, বর্ষা আহমেদ,
এ.কে আহমেদ রাহাত সিদ্দিকী প্রিন্স
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০৫ আবার এসেছে অমর একুশে
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
ক. আবার এসেছে অমর একুশে: সাবিনা ইয়াসমিন
কথা ও সুর: আব্দুল লতিফ
খ. গান: মোদের গরব মোদের আশা: সমবেত কণ্ঠে
কথা ও সুর: অতুল প্রসাদ সেন
গ. গান: অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে সেদিন বর্ণমালা:
স্মরণ, মোমিন, সাব্বির ও নিশীতা
ঘ. পলাশের দিনে পলাশ হয়ে: এন্ড্রু কিশোর
সুর: ফরিদ আহম্মেদ
ঙ. গান: আমায় গেঁথে দাওনা মালো: রুনা লায়লা
গবেষণা ও গ্রন্থনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
উপস্থাপনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু ও সেলিনা আক্তার শেলি
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল

পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২১ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ ● ৭ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ [চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল]

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন
ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফএম ১০২ মেগাহার্জ)
রাত

১২-১৫ এলো ফিরে: নাটক
কাহিনী: নাজমুল আলম
বেতার নাট্যরূপ: ফরুখশিহর
প্রযোজনা: আতিকুল হক চৌধুরী (পুন: প্রচার)

২-০০ এলো খুশির ঈদ: বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা, গীত রচনা, সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: মিল্টন খন্দকার
প্রযোজনা: মো. মনিরুজ্জামান (পুন: প্রচার)

ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ (এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ)
সকাল

১০-০৫ ঈদের সওগাত: বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও গীত রচনা: মনিরুজ্জামান মনির
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: আশরাফ বাবু
প্রযোজনা: মো. মনিরুজ্জামান

১০-৩৫ ছন্দে ও পংক্তিতে ঈদ আনন্দ: কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: কাজী নৌরীন ইসলাম

বেলা

১১-০৫ ফুলপাখিদের গান:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: আশরাফ হোসেন
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: সুমন রেজা খান
উপস্থাপনা: আদিবা সুলতানা আলিফা ও
ওয়াসির সারোয়ার প্রাঞ্জ
প্রযোজনা: ইশরাত শারমিন

দুপুর

১২-১০ তারুণ্যের ঈদ:
ক্যাম্পাস ভিত্তিক তরুণদের নিয়ে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: সাদিয়া ইসলাম লিজা
প্রযোজনা: মো. দেলোয়ার হোসেন

বেলা

২-২০ ঈদের খুশি এলো ঘরে:
নারীদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

৩-২৫ কাব্য কথায় ঈদ আনন্দ:
আবৃত্তি শিল্পীদের বিশেষ ঈদ আড্ডা
সঞ্চালনা: মহিউদ্দিন তাহের
প্রযোজনা: কাজী নৌরীন ইসলাম

রাত

৯-০৫ শ্রোতাদের ঈদ আনন্দ: শ্রোতাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
বিষয়: শ্রোতাদের ঈদ শুভেচ্ছা, ঈদ নিয়ে স্মৃতি, ছড়া,
কবিতা-গল্প
গবেষণা ও গ্রন্থনা: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
উপস্থাপনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও
জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৯-৪৫ বেতার বিবরণী: বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. দুলাল হোসাইন

১০-০০ সাজাহান: বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: ড. মোঃ মনজুরুল হক (নতুন)

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

সকাল

১০-৩০ ঈদের খুশি প্রাণে প্রাণে:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: আয়েশা খাতুন
শিশু উপস্থাপক: আদিলা চৌধুরী
প্রযোজনা: জ্যোতির্ময় গোলদার

বেলা

১১-০৫ ছায়াগীতি: বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাচিত গান নিয়ে বিশেষ
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১১-৩০ আনন্দ আনন্দ: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজনীন আকতার রেখা
সাক্ষাৎকার: বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ এবং রাষ্ট্র
বিনির্মাণে ঈদ-উল-ফিতরের শিক্ষা
প্রদান: প্রফেসর ড. আ ক ম আব্দুল কাদের
গ্রহণ: ড. মো. মুমিনুল হক
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

২-১৫ ঈদের চাঁদ: স্বরচিত কবিতা পাঠ ও কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জেবুন নাহার
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

২-৩০ এলো খুশির ঈদ: যুবগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: রিয়াজ উদ্দীন
প্রযোজনা: মো. নাঈম সিদ্দিকী

৩-০৫ ঈদ আড্ডা: শ্রোতাদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারহানা সাদেক
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

৩-৩০ অনন্যার ঈদ: নারীদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. আনোয়ারা বেগম
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

বিকাল

৪-০৫ ছোট্ট কুটিরে চাঁদের হাসি: বিশেষ জীবন্তিকা
রচনা: তাপস মাহমুদ
প্রযোজনা: মো. মঈন উদ্দিন

৫-১০ আনন্দমেলা: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ
উপস্থাপনা: পারভীন আকতার
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৫-৩০ ঝংকার: ব্যান্ড সংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রেজোয়ানা আরেফিন মিমি
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দীন আহম্মেদ চৌধুরী
বহিঃপ্রচার ধারণ ও সম্পাদনা: সুনপ তালুকদার
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

১০-০০ ঈদের সওগাত: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মাসুম ফেরদৌস
উপস্থাপনা: নাহিদ সুলতানা ও ইমরান মাহমুদ ফয়সাল
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১০-৩০ চাঁদ মুখে মধুর হাসি: বিশেষ নাটক
রচনা: কোহিনুর আকতার শাকি
প্রযোজনা: মো মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

সকাল

১০-১০ খুশির জোয়ার: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. রুমি সায়লা শারমিন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

১০-৪০ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে গম্ভীরা:
পরিবেশনা: মো. সাইদুর রহমান ও তার সঙ্গীরা

বেলা

১১-০০ ছায়াগীতি: সিনেমার গান ও সংলাপ নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: জিহাদ জনি, উপস্থাপনা: জিহাদ জনি ও
ফরিদা ইয়াসমিন অর্পি
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

দুপুর

১২-১৫ খুশির ঈদ এলোরে: গীতিনকশা
রচনা: জামাল দ্বীন সুমন
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: শাহেদুজ্জামান খান চপল
বহ্নি বর্ণনা: হুমায়রা বিনতে আজাদ
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

২-৩০ ঈদের সেকাল একাল: বিভিন্ন পেশাজীবীর অংশগ্রহণে
আড্ডামূলক অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আশিকুর রহমান রূপম
অংশগ্রহণ: ডা: মৌসুমি সরকার, মুহা. হাফিজুল ইসলাম এবং
আবু সালেহ মো. ফাত্তাহ
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৩-০৫ প্রহরে প্রহরে আনন্দ: বিশেষ নাটক
রচনা: দেওয়ান হামিদুজ্জামান বাচ্চু
প্রযোজনা: মো. জুলফিকার আলী

বিকাল

৫-২০ ফেসবুক ডট কম: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শহীদুল হক সোহেল
ক. ফেসবুক নিয়ে কৌতুক: মাসুম আক্তারুজ্জামান,
সাজরীন খান খুশবু
খ. ফেসবুকে সম্রাট শাহজাহান (রম্য নাটিকা):
মিজানুর রহমান ও আঞ্জুমান আরা খাতুন শিফা
গ. অনলাইনে ঈদের কেনাকাটা (রম্য কথিকা):
মোহসিনা পারভীন
প্রযোজনা: মো. নাজমুল হাসান

সন্ধ্যা

৬-২৫ রিদম: ব্যান্ডের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আনিসুর ইসলাম সানি
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

রাত

৯-০০ সেলুলয়েডে ঈদ: ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবির গান ও
অংশবিশেষ নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লতিফা তাহেরা খাতুন ইতি
প্রযোজনা: তনুশ্রী সান্যাল

১০-২০ গানে গানে ঈদ: শ্রোতাদের পাঠানো চিঠি ও
ই-মেইল থেকে অনুরোধের গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুল খালেক
উপস্থাপনা: শাহানা পারভীন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

১০-৩০ ঈদের খুশি: বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: মো. ইকবাল হোসেন
উপস্থাপনা: সুমাইয়া সুয়াদী
সুর ও সঙ্গীত: মো. আহসান হাবিব
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

বেলা

১১-৩০ ঈদের চাঁদে খুশির আভা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মো. তউহিদুল ইসলাম সরকার
উপস্থাপনা: কে এম লুৎফুল কবীর ও নাসিমা চৌধুরী লিপি
সুর ও সঙ্গীত: জান্নাতুল ইসলাম কবীর
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

৩-০৫ নানা ভাষায় ঈদের গান:
বিভিন্ন ভাষায় ঈদের গান নিয়ে অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: খাদিজা জাফরিন
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

বিকাল

৫-১০ নেপথ্যজনের ঈদ: ঈদের আড্ডা
রংপুরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে
উপস্থাপনা: ইফতেখারুল আলম রাজ ও জিন্নাতুন নাহার
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

১০-১০ রোজার রোশনায় ঈদ আনন্দ:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: মো. সালেহ আহমদ খসরু
প্রযোজনা: মো. ইকবাল হোসেন

বেলা

১১-৩০ এলো খুশির ঈদ: ঈদের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
উপস্থাপনা: সায়মা সুলতানা
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-৩০ চিত্র মেলা: ছায়াছবির গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রিফাত আরা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

বেলা

১-৩০ আনন্দ উচ্ছাস: শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: স্বপন খান
ধারাবর্ণনা: সাদমান সাকিব নাফিস
গ্রন্থনা: শিমুল আক্তার
উপস্থাপনা: রাই চৌধুরী
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

৩-৩০ বাঁকা চাঁদে খুশির ঝিলিক: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শাহানা বেগম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: মো. কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনা: ইফফাত আরা ইশহাক
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

বিকাল

৪-৩৫ রূপালী গীটার: ব্যান্ড সঙ্গীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তালুকদার হাবিবুর রহমান
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৫-৩০ রোজার শিক্ষা ও ঈদের আনন্দ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: অধ্যাপক জেবা আমাতুল হান্না, মাওলানা মো. শাহ আলম, মো. সিরাজুল ইসলাম
সঞ্চালনা: আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
প্রযোজনা: ফাতেমাতোজ জোহরা

রাত

১০-০০ আহা কি আনন্দ: বিশেষ নাটক
রচনা: মুহিত চৌধুরী
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৬-৫৫ ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে: ঈদের গান সমবেত কণ্ঠে

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

২-১০ ঈদের কাব্য: স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুহা: গোলাম মোস্তফা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

২-৩০ গানে গানে ঈদ আনন্দ: গীতিনকশা
রচনা: এস এম নাসির উদ্দিন
সুর ও সংগীত পরিচালনা: মো: তারিকুল ইসলাম
বর্ণনা: তাসফিয়া নওরিন মিতু
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

৩-০৫ এলো খুশির জোয়ার: নাট্যানুষ্ঠান
রচনা: মো. ওসমান গনি
বেতার নাট্যরুপ: মোস্তাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: এফ এম সেলিম

বিকাল

৫-৪০ নতুন চাঁদের মিষ্টি হাঁসি: শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে গান কবিতা সমন্বয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
বর্ণনা: আনিকা আলম লিনাথ
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

৯-০৫ বরিশাল থেকে বলছি: শ্রোতাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়মূলক ফেসবুকভিত্তিক লাইভ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কর্তাবরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

১০-৩০ শাওয়ালের চাঁদ: গানের অনুষ্ঠান

১০-৪৫ বেতার বিবরণী: ঈদের জামায়াত ও সাধারণ মানুষের ঈদের অনুভূতি নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা, বহিঃধারণ ও সম্পাদনা: মো: শহীদুল হক
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

মধ্যম তরঙ্গ ৩০০.৩০ মিটার ব্যান্ড ৯৯৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

২-৩০ হাসির ঝলক: বিশেষ রম্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমুল হুদা সোহান
অংশগ্রহণ: হিমালয় চন্দ্র এবং অন্তরা দত্ত
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৩-০৫ আনন্দের ফেরিওয়ালা: বিশেষ নাটক
রচনা: আইভি রহমান
প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

বিকাল

৪-৩০ সুরে সুরে ঈদ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদুন্নবী প্রধান
ধারাবর্ণনা: তানিয়া আক্তার ও রফিকুল ইসলাম
সুর ও সংগীত পরিচালনা: কায়ছার আলী রুবেল
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৫-১০ ঈদ আড্ডা:
শ্রোতাদের অংশগ্রহণে বিশেষ ফোন-ইন আড্ডানুষ্ঠান
উপস্থাপনা: মো: মোস্তাক আহমেদ ও জহুরা খাতুন
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

সন্ধ্যা

৬-১০ খুশির পরশ: নারীদের অংশগ্রহণে আড্ডাধর্মী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আতিকা ইসলাম রিতু
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

২-০৫ ঈদের খুশি লাগলো প্রাণে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: হাসান মাহমুদ মনজু
ধারাবর্ণনা: মো. তারেক আহমেদ ও রুখসানা আকতার
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৩৫ আনন্দের ঝিলমিল:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
রচনা: মো. ফখরুজ্জামান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তাসনিম সালেহ
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ অনন্যার ঈদ: মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শিখা ত্রিপুরা
ক. দিবস ভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা উপস্থাপক
খ. ঈদ আড্ডা: ঈদ আনন্দের একাল সেকাল
সাক্ষাৎকার প্রদান: শিরিন পারভীন
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-২৫ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ঈদ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাও: মো. নুরুল আলম সিদ্দিকী
অংশগ্রহণ: মো. ইকবাল বাহার চৌধুরী, মো. আকতার হোসেন চৌধুরী, মো. আনোয়ারুল হক
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

বিকাল

৪-৩০ রেনেসার্স: যুব সমাজের বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুরে নাজিবা নুহা
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৫-২০ বেতার বিবরণী:
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বেতার প্রতিবেদন
সংগ্রহ: মো. কাওসার আহমেদ

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

সকাল

১০-৩০ ঈদের চাঁদের মুখ:
যুবসমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারহানা রহিম সূচি
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বেলা

১১-০৫ ঈদের খুশী: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
অংশগ্রহণ: কে এম সানাউল হক, রোকসানা আকতার আসমা, রোমেনা আকতার, নাজনীন আকতার মেরী
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

দুপুর

১২-১০ আনন্দেরই ঝর্ণাধারা: নারীদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জ্যোৎস্না ইয়াসমিন
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বেলা

১-৩৫ খুশির ছটা: বিশেষ নাটক
রচনা: মঈনুদ্দিন কোহেল
নির্দেশনা: স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: এ এস এম নাজমুল হাছান

২-০৫ খুশির চাঁদ উঠেছে:
শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাবিহা মামুন
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-৩৫ ঈদের চাঁদে খুশীর বারতা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: খোরশেদুল আনোয়ার
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: মোহাম্মদ সাহেদ ও বুলবুল আকতার চৌধুরী
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৭-৩০ ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ:
নির্বাচিত গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
উপস্থাপনা: মাহামুদা সুখী
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

২য় অধিবেশন

বেলা

২-০৫ তারুণ্যের ঈদ:
তরুণ প্রজন্মদের নিয়ে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হারুন অর রসিদ
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

৩-৩০ খুশির ছোঁয়া প্রাণে প্রাণে:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বান্দরবান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল

৪-১০ কবিতায় ঈদ: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হোসনে আরা খানম
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাইদ হায়দার

৪-৩৫ ঈদ আনন্দ ঘরে ঘরে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মো. সৈয়দুল হক
ধারাবর্ণনা: নাদিয়া সুলতানা লোপা, নেসার আহমেদ জাকির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

বেলা

২-০৫ ঈদ মোবারক: ঈদের গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. খায়রুল বাশার বাঁধন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

২-৩০ তারুণ্যের ঈদ ভাবনা:
যুব সমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হেরা ফালাক আলিশা
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৩-০৫ বিশেষ নাটক: চাঁদের বুকে আনন্দের ঢেউ
রচনা: মোঃ আশরাফ হোসেন
প্রযোজনা: সৈয়দ মো: বিলাল উদ্দিন

৩-৩০ নারীর চোখে ঈদ আনন্দ:
নারীদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সোহানা শারমিন রাকা
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বিকাল

৪-০৫ ঈদ আড্ডা: ঈদে বেতারে দায়িত্ব পালনের স্মৃতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: সুমাইয়া আক্তার, বাহারুল আলম ও নুর হোসাইন রাজীব
সঞ্চালনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৪-৪০ সাম্য, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধে ঈদ:
বিশেষ দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মাওলানা মো. ইব্রাহিম মাহমুদি,
হাবিবুর রহমান আল ফরিদী, মাওলানা শাহজালাল সিরাজী
সঞ্চালনা: মাওলানা মোশাররফ হোসাইন
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৫-১০ বাংলার কৃষক ও কৃষিজীবীদের ঈদ আনন্দ
অংশগ্রহণ: ড. জামাল উদ্দিন, কৃষিবিদ দিলরুবা খানম ও
দেলোয়ার হোসেন (সফল কৃষক)
সঞ্চালনা: মো. মহসিন মিজি
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম মেহেদি হাছান

৫-৩৫ চাঁদের হাসি: বিশেষ গীতিনক্সা
গীত রচনা: নাজমুল হুদা
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: শাহীন সর্দার
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা

৬-০০ ছন্দে-কথায় ঈদ: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-২৫ শিশুদের উচ্ছাসে ঈদ আনন্দ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফ.এম ৯২.০ মেগাহার্জ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-৩৫ ঈদ এসেছে: ইদের গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: শরিফা রহমান
উপস্থাপনা: ইনিজামামুল হক ও শরিফা রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-০৫ ছন্দে আনন্দে:
জনপ্রিয় ছায়াছবির গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মৌসুমী আক্তার
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

১০-৩০ আনন্দ ভুবন: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এস এম সফিউল্লাহ রাজ ও সেলিনা আক্তার শাম্মী নুপূর
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বেলা

১১-০৫ বর্ণিল সুরে ঈদের আনন্দ:
জনপ্রিয় আধুনিক গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুকাইয়া জামান সিথী
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

দ্বিতীয় অধিবেশন

বেলা

৩-০৫ সব গল্প রম্য নয়: নাটক
রচনা: গোলাম মোস্তফা সুমন
প্রযোজনা: খায়রুল আলম সবুজ

বিকাল

৪-২০ খুশির ঈদ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৫-১০ পবিত্র ইদ উল ফিতরের শিক্ষা ও তাৎপর্য:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. আবু সাঈদ মো: আব্দুল্লাহ
অংশগ্রহণ: আবু অবায়দা মো: মাস-উ-দুল হক, মো: আরিফুর
রহমান, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

সন্ধ্যা

৬-৪৫ বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি: ধারণ ও ধারা বর্ণনা: মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-২০ ঈদ আড্ডা:
গল্প, আড্ডা, গান ও কবিতার গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কামরুল হক ইমরান ও
ফওজিয়া রেজওয়না লনি
অংশগ্রহণ: মো. আরিফুর রহমান, পারিকা মোস্তফা পূণ্য ও
মোহাইমেন হোসেন
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

৯-৩৫ শিউলি মালা: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

১০-১০ আনন্দ ঝংকার: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গল্প, গান ও
কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: কনা আক্তার
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

২য় অধিবেশন

৩-০৫ শো বেজড ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান:
হ্যালো মাইমেনসিং-এর বিশেষ পর্ব

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাশরিকি খান মাহিন ও কথা আক্তার
প্রযোজনা: মো. রবিউল আউয়াল মারুফ

বিকাল

৪-০৫ বর্নালী ঈদ: ব্যান্ডের গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান

৫-১০ আনন্দ ঝংকার: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গল্প, গান ও কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: কনা আক্তার
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

৫-৪৫ শিউলি মালা: নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য পুষ্টি সেল

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. ঈদের গান: চাঁদের খামে বার্তা এলো
কথা: সাফাত খৈয়াম, সুর: হাবিবুল আল খান
গ. ভালো খবর মন্দ খবর: বিশেষ রম্য নাটক
রচনা: ইকবাল খোরশেদ
প্রযোজনা: সৈয়দা তাসলিমা আক্তার
ঘ. সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা: ঈদের দিনে দীর্ঘ মেয়াদী ডায়াবেটিকস ও
উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন এমন রোগীদের খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সচেতনতা
সাক্ষাৎকার প্রদান: পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মামুন উর রশিদ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা: ঈদের একাল সেকাল
সাক্ষাৎকার প্রদান: মাসুদ আলী খান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: লায়লা আরিয়ানী হোসেন
গ. ঈদের গান: ঈদের গভীর মর্মবাণী
কথা: আকরাম হোসেন, সুর: মো. শওকত হোসেন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ শাওয়ালের ঐ চাঁদের হাসি: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গান রচনা: নুরুল ইসলাম মানিক
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: ফয়সাল আহমেদ
উপস্থাপনা: তানিয়া সুলতানা ও লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

দুপুর

১২-০৫ ঈদের একাল সেকাল:
প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের ঈদ উদ্‌যাপনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রামাণ্যধর্মী বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মামুন উর রশীদ
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

সন্ধ্যা

৬-০০ সিনে গানে ঈদ: মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় গান নিয়ে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মো. আমিনুল ইসলাম
উপস্থাপনা: মো. আমিনুল ইসলাম ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর

External Service
12-15 am (English 2nd transmission)
6-43 pm (English 1st transmission)
Eid-ul-Fitr: A day of Gaiety
a. Intro on the Celebration of Eid-ul-Fitr.
b. Song: O mon Ramjaner oi rojar shesh
(ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে)
Singer: Runa Laila
Lyric: Kazi Nazrul Islam.
c. Discussion: Eid Jubilance of the Expatriate Bangladeshis and Foreigners.
Participants: Selected Expatriate Bangladeshis and Foreigners.
Moderator: Zubair Hamid Quraishi.
d. Poem: Eid Mubarak (ঈদ মোবারক)
Recited by: Mahidul Islam
Poet: Kazi Nazrul Islam
e. Song: Ekti Masher Siam Sheshe

(একটি মাসের সিয়াম শেষে)
Singer: Md. Khurshid Alam.
Lyric: Masud Karim.
Research and Compilation: Munshi Rafikul Islam
Presented by: Shamim Khan
Produced by: Umma Farhana Hossain Shimu

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর
রাত ১-৩৫ থেকে রাত ২-০০
রাত ১০-৩৫ থেকে রাত ১১-০০
সুরের ঝংকার
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু
রাত ১-৩৫ থেকে রাত ২-০০
রাত ১০-৩৫ থেকে রাত ১১-০০
আনন্দ আনন্দ: ঈদের বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: আব্দুল আজিজ
রাত ১-৩৫ থেকে রাত ২-০০
রাত ১০-৩৫ থেকে রাত ১১-০০
একটুখানি মন:
বিভিন্ন ছায়াছবির গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জিনাত আকতার
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান: কৃষি সমাচার
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
ক. ঈদের গান: ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
শিল্পী: ফেরদৌসী রহমান
খ. আমার কৃষি: কৃষকের ঈদ আনন্দ: ইসমাত জাহান এমি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা : জান্নাতুল ফেরদৌস
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. বিশেষ নাটক: চাঁদের হাসি
রচনা: নূর নাহার
প্রযোজনা: মো: মোশাররফ হোসেন
খ. ঈদের রসুই ঘর: লবী রহমান
অনুষ্ঠান পরিচালনায়: জাহিদ হোসেন বাবুল
অংশগ্রহণ: আলহাজ্ব ফারুক আহমেদ, রিজিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান:
তরুণ কৃষিবিদদের ঈদ আড্ডা: কাইয়ুম কাফি,
শাহেদ মাহমুদ ও ইফফাত মাইজেনা মাহদিয়াত খান
খ. গান: ঈদের খুশি বাধ মানে না: রুখসানা মুমতাজ
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০০ নতুন চাঁদ: গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী ও মো. ইসাহাক আলী
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ ● ১২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফএম ১০২ মেগাহার্জ)

রাত

১২-১৫ বিভাসীত হৃদয়ের কাছে: নাটক
রচনা: মোস্তফা মো. আব্দুর রব,
প্রযোজনা: আব্দুল আজিজ। (পুন: প্রচার)

ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ (এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ)

সকাল

৮-১৫ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে: মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ বেতারের অবদান:
মো. আবু নওশের
খ. গান: মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি:
আপেল মাহমুদ
গ্রন্থনা: মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

৯-০৫ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মাহমুদুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম,
ড. মোরসেদ হাসান খান
সঞ্চালনা: শেখ মোহাম্মদ শামীম
প্রযোজনা: মো. দেলোয়ার হোসেন

৯-৩০ লাল সবুজে আঁকা স্বাধীনতা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতি নকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: মুহম্মদ মাহবুব উল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মো. আলী আশরাফ
উপস্থাপনা: আয়াত হোসেন ও ওয়াসি সারোয়ার প্রজ্ঞা
প্রযোজনা: ইশরাত শারমীন

১০-০৫ ছন্দে ও পংক্তিতে স্বাধীনতা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: কাজী নৌরীন ইসলাম

১০-২০ হৃদয় জুড়ে স্বাধীনতা: বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: মুন্সী ওয়াদুদ
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
খন্দকার রাশেদুল হক (মিল্টন খন্দকার)
উপস্থাপনা: এ, বি, এম, শাহিনুজ্জামান ও
ইয়ারমা শাহেদ জাহান
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু ও মো. মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য: জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র সমূহের
সম্পাদকীয় ও বিশেষ ক্রোড়পত্র পাঠের অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মীর নাসির আহমেদ নিউটন, মীর আশফাক
হোসেন, শাহনাজ পারভীন, সিকদার নসরত আলী কনুজ
সঞ্চালনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

৩-০৫ সেই সূর্যটা: গল্প থেকে নাটক
রচনা: মো. আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: জুলফিকার রহমান কুরাইশী (পুনঃপ্রচার)

৩-৩৫ তারুণ্যদীপ্ত বাংলাদেশ:
তারুণ্যের শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে অনুষ্ঠান
উদ্যমে উজ্জ্বল তারুণ্য: তরুণ উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মো. ইসহাক আলী
গ্রন্থনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা: আবু রায়হান কবির রাসেল ও জয়া সাহা
প্রযোজনা: মো. দুলাল হোসাইন

৫-৩০ স্বাধীনতার পংক্তিমালা: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মহিউদ্দিন তাহের
প্রযোজনা: কাজী নৌরিন ইসলাম

সন্ধ্যে

৬-৩৫ বেতার বিবরণী: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারা বর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. দুলাল হোসাইন

১০-০০ রক্তে ভেজা সূর্যোদয়: নাটক
রচনা: গোলাম মোস্তফা শিমুল
প্রযোজনা: জিয়াউল হাসান (নতুন)

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

৮-১৫ আলোকপাত: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: প্রিয়ম কৃষ্ণ দে
বিশেষ সাক্ষাৎকার: মহান স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: প্রফেসর মো. আব্দুল্লা আল মামুন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শরীফুন নাহার
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

৯-০৫ সুরে ছন্দে বাংলাদেশ: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আবছার উদ্দীন অলি
উপস্থাপনা: পারভীন আখতার
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৯-৩৫ জন্ম আমার ধন্য হলো: শিশু কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: আয়েশা খাতুন
প্রযোজনা: জ্যোতির্ময় গোলদার

১০-১৫ সম্পাদকীয় মতামত: প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকার
সম্পাদকীয়ের উপর ভিত্তি করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

১১-১৫ অরুণোদয়: যুব সমাজের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. রিয়াজ উদ্দিন
প্রযোজনা: মো. নাঈম সিদ্দিকী

দুপুর

২-১৫ প্রিয় স্বাধীনতা: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জেবুন নাহার শারমিন
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

২-৩০ রক্তে লেখা স্বাধীনতা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এস আনিস আহম্মেদ বাচ্চু
উপস্থাপনা: আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সেঁজুতি দে
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

বিকাল

৩-৩০ অপরাজিতা: নারীদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তহুরীন সবুর
আলোচনা: নারীর স্বাধীনতা ও স্বাধিকার– ৭১ থেকে বর্তমান
অংশগ্রহণ: আনোয়ারা বেগম, তাহমিনা সানজিদা সাহীদ,
সানজিদা আলম
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী: চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ ও সম্পাদনা: সুনপ তালুকদার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

১০-০০ মহান স্বাধীনতা দিবস ও আমাদের প্রত্যাশা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. আনোয়ারা বেগম
অংশগ্রহণ: সালাউদ্দিন মো. রেজা, এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন,
মো. ইফতেখার হোসেন চৌধুরী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-৩০ নতুন ভোর: বিশেষ নাটক
রচনা: মিরন মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রযোজনা: মো. মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

বিরতিহীন অধিবেশন

সকাল

৮-১৫ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে: স্বাধীনতার গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জিহাদ জনি
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৮-৪৫ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা: মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি-সাক্ষাৎকার:
বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: রোকসানা আক্তার লাকি
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

৯-০৫ প্রিয় স্বাধীনতা: শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. রুমি শায়লা শারমিন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-৩৫ রক্তিম সূর্যোদয়: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুর সালমা খাতুন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-০০ স্বাধীনতা মুক্ত পাখির ডানা: গীতিনকশা
রচনা: রফিকুল হাসান
সুর-সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: শাহেদুজ্জামান খান চপল
বর্ণনায়: শিখা খাতুন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন (পুন:প্রচার)

বেলা

১১-০৫ পতাকা: বিশেষ নাটক
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
প্রযোজনা: ডা. আফজালুর রহমান সিদ্দিকী (পুন: প্রচার)

১২-১৫ স্বাধীনতার নতুন সূর্য: গীতিনকশা
রচনা: জোনাব আলী
সুর-সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: অনন্ত কুমার
বর্ণনা: বিলকিস বেগম
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বিকাল

৩-৩০ মহান স্বাধীনতা দিবসের উপর গম্ভীরা
পরিবেশনা: আব্দুর রাজ্জাক ও তার দল

৫-১০ স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যাশা: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আবরার সাঈর
অংশগ্রহণ: ড. ইফতিখারুল ইসলাম মাসউদ ও
ড. নুরুল মোমেন
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

রাত

৯-২০ সংবাদ বিচিত্রা: রাজশাহী বেতার অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও বহিঃধারণে: ফেরদৌস উর রহমান
উপস্থাপনা: ফারজানা ইয়াসমিন বর্ণা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-০০ কৃষ্ণপক্ষের রাতে উল্লাসের আলো: বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: দেওয়ান হামিদুজ্জামান বাচ্চু

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

সকাল

৯-০৫ স্বাধীনতা এক সোনালি সূর্য:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: মো. সাহেদুল ইসলাম
উপস্থাপনা: সানিয়া জাহান সারা
সুর ও সঙ্গীত: মো. তামজিদুর রহমান
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত: দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম
নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মাহবুবুর রহমান
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

১২-১৫ ১৯৭১ এর স্বাধীনতার প্রেক্ষিত ও প্রাপ্তি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: ড. মাগফুর হোসেন
অংশগ্রহণ: সিরাজাম মুনিরা, মো. হাবিবুর রহমান,
মেজর মো. হারুন অর রশিদ
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

১-০৫ সংগ্রামী চেতনায় স্বাধীনতা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রফিকুল ইসলাম রইস
উপস্থাপনা: মো. ফিরোজ হোসেন ও নুজহাত শাখি
সুর ও সঙ্গীত: জিয়াউল হক লিপু
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

৩-০৫ ও আমার বাংলাদেশ, প্রিয় জন্মভূমি:
স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা উপস্থাপনা: মোছা. সরমিন আরা হক
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

৫-১০ মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ:
ড. এ কে এম মাসুদুল হক
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

১০-০০ শব্দ যখন বারুদ: বিশেষ নাটক
রচনা: মো. মোস্তাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: জিন্নাতুন নাহার

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-১০ আমাদের স্বাধীনতা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মো. আব্দুল আউয়াল
গ্রন্থনা: শিমুল আক্তার
উপস্থাপনা: হুমায়রাতুল জান্নাত নওরিন
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

১০-০৫ রক্তে লেখা কবিতা: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: শামীমা চৌধুরী

১০-৩০ দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফয়সল উদ্দিন
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

১১-৩০ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান নিয়ে গ্রন্থিথ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
উপস্থাপনা: রিফাত আরা
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-১৫ কারার ঐ লৌহকপাট:
দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

১-৩০ তারুণ্যের বাংলাদেশ: তরুনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাবিহা আহমেদ
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

বেলা

২-০৫ রক্তিম অরুণোদয়: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শাহানা আক্তার,
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
উপস্থাপনা: আফিফা আফরিন
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

৩-০৫ মুক্তির কণ্ঠস্বর: স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: সালেহ আহমেদ খসরু
প্রযোজনা: মো. ইকবাল হোসাইন

বিকাল

৪-৩৫ আত্ম পরিচয়ের উৎস: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: আরিফুল হক চৌধুরী,
ড. এম সরওয়ার উদ্দীন চৌধুরী, মুক্তাবিস উন নুর
সঞ্চালনা: গোলজার আহমদ
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

৫-৩০ স্বাধীনতার চেতনা: বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃপ্রচার ধারণ, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: এম রহমান ফারুক
বর্ণনা: মো. জাহাঙ্গীর আলম
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

রাত

১০-০০ পোড়া মাটির ঘর: বিশেষ নাটক
রচনা ও নির্দেশনা: মু. আনোয়ার হোসেন রনি
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-৪৫ স্বাধীনতা আমার অহংকার: মাসব্যাপী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. মো. শামীম আহসান
সাক্ষাৎকার প্রদান: সোহরাব হোসেন হাওলাদার
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ লাল সবুজের পতাকা: শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: বিলকিস বানু বেগম
বর্ণনা: রওনক গাইন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৩০ স্বাধীনতার কাব্য: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও সঞ্চালনা: হাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

২য় অধিবেশন

দুপুর

২-১৫ স্বাধীনতা তুমি দৃপ্ত শপথ: গীতিনকশা
রচনা: রবীন্দ্রনাথ মন্ডল
বর্ণনা: মহিউদ্দিন বায়জিদ ও শাহিদা খানম
সুরও সংগীত পরিচালনা: সহিদুজ্জামান মামুন
প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

৪-০৫ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি: আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও সঞ্চালনা: জাহিদ হোসেন
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আলম ফরিদ ও মোহসিনা হোসাইন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৩০ বেতার বিবরণী: বরিশাল ও এর আশে-পাশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা ও বহিঃধারণ: মেজবাহ উদ্দিন
গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: মুছা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-২০ লাল সবুজে নতুন প্রজন্ম:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: উম্মে সালমা রিপা, উপস্থাপনা: ঈমানী ইকবাল
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

১০-০৫ উত্তাল মার্চ: মাসব্যাপী বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: বিউটি আখতার
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

১০-৩০ মুক্তির গানে গানে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদুন্নবী প্রধান
ধারাবর্ণনা: জহুরা খাতুন ও আতিয়ার রহমান
সুর ও সংগীত পরিচালনা: তুষার কান্তি বর্ধন
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-১০ একটি পতাকার গল্প: বিশেষ নাটক
রচনা: আজমত রানা
প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

৪-০৫ মুক্তির কবিতায় বাংলাদেশ: কবিতা আবৃত্তি বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: লাইলী বেগম
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

৫-৩০ একাত্তরের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মো. আখতার হোসেন
অংশগ্রহণ: প্রফেসর মোহাম্মদ আলী মনসুর,
মো. আব্দুল লতিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর করিম
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

৬-১০ জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় পর্যালোচনা
সংকলন, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: আতিয়ার রহমান
অংশগ্রহণ: এস এম জসিম উদ্দিন
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

৬-২৫ ঠাকুরগাঁও এবং এর আশেপাশে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: এম এ সামাদ
প্রযোজনা: মো. নুরুল আবছার

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-১০ নতুন সূর্যোদয়: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুরী
ধারা বর্ণনা: মো. কাওসার আহমেদ ও চৈতি ঘোষ
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: রনেশ্বর বড়ুয়া
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৪০ স্বাধীনতার পংক্তিমালা:
স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: বিপম চাকমা
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-১০ স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যাশা: স্বনির্ভর বাংলাদেশ
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আনন্দ জ্যোতি চাকমা
অংশগ্রহন: ড. মো. আতিয়ার রহমান, পারভীন আক্তার ও
অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসিমুল হক
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-০৫ স্বাধীনতার রাঙা সূর্য: যুব সমাজের জন্য অনুষ্ঠান
উপস্থাপক: সাদিয়া রহমান মুনমুন
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৩৫ লাল সবুজের মেলা:
শিশু কিশোরদের বিনোদনমূলক বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষনা গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কলি চাকমা
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ স্বাধীনতা তোমার জন্য:
স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরুপ: মো. সোহেল রানা
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৪০ অগ্নি শিখা: মহিলাদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা গ্রন্থনা ও পরিচালনা: শিখা ত্রিপুরা
অংশগ্রহন: যশস্বী চাকমা, ইফফাত জাহান জুলি

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

সকাল

১০-০৫ তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
অংশগ্রহণ: ফালগুনী দাশ, তাপস বড়ুয়া, আশুতোষ রুদ্র, রোকসানা আকতার আসমা
প্রযোজনা: এস এম নাজমুল হাছান

১০-৩০ মুক্তির আনন্দে আমরা:
শিশু কিশোরদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুশদিয়া বিনতে তাহের
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

১১-৩০ একটি পতাকার গল্প:
যুবসমাজের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আফিফা ইয়াসের উলফা
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

দুপুর

২-৩৫ স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যাশা: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনায়: নুরুল ইসলাম
অংশগ্রহণ: দিলোয়ার চৌধুরী, অজিত দাশ
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-০৫ স্বাধীনতার সকাল: বিশেষ নাটক
রচনা: খোরশেদুল আনোয়ার
নাট্য নির্দেশনা: স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: এস এম নাজমুল হাছান

৩-৩৫ মুক্তির আলো: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শাহীন আকতার
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
ধারা বর্ণনায়: ইমাম হোসেন ও রুবিনা পারভীন
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৭-৩০ স্বাধীনতার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এজেড এম আরফান হাবিব
উপস্থাপনা: এ এস এম আহসানুল আলম
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৮-১০ তারুণ্যের স্বাধীনতা: তরুণ প্রজন্মের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সাক্ষাৎকার: হারুন অর রসিদ
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

২য় অধিবেশন

বেলা

২-০৫ স্বাধীনতার পংক্তিমালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবছার উদ্দিন অলি
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: সৈয়দুল হক
ধারা বর্ণনায়: জয়ন্তী চৌধুরী ও নেসার আহমেদ জাকির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৩০ অগ্নি ঝরা মার্চ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: জাহাঙ্গীর আলম, আলমগীর চৌধুরী, মেহেদী হাসান
সঞ্চালনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা: আহাদ মো. সাঈদ হায়দার

বিকাল

৪-১০ লাল সবুজের বাংলাদেশ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বান্দরবান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৪-৪৫ বেতার বিবরণী: বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রিব্বানুল কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

সকাল

৮-১০ স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুল হক চৌধুরী,
ড. এম এম শরীফুল করিম
সঞ্চালনা: মো. শাহজালাল
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৮-৫০ অগ্নিঝরা মার্চ: মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. জি এম মনিরুজ্জামান
প্রযোজনা: এ. এইচ. এম মেহেদি হাছান

৯-৩৫ লাল-সবুজের বাংলাদেশ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বেলা

২-৩০ তারুণ্যের মননে বাংলাদেশ:
যুবদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আমেনা আক্তার
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বিকাল

৩-০৫ রক্তে লেখা স্বাধীনতা: বিশেষ নাটক
রচনা: মো. আশরাফ হোসেন
প্রযোজনা: সৈয়দ মো. বিলাল উদ্দিন

৩-৩০ প্রথম বাংলাদেশ আমার: গ্রন্থণাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: সাদিয়া শারমিন
প্রযোজনা: এ. এইচ. এম মেহেদী হাছান

৪-০৫ তুমি নির্ভীক, তুমি গণতন্ত্রের প্রতীক:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৪-৪০ বিজয়ের পথরেখায় নারী:
নারী সমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রোখসানা ইয়াসমিন মনি
প্রযোজনা: এ. এইচ. এম. মেহেদি হাছান

৫-৩৫ লাল সবুজের গান: বিশেষ গীতিনক্সা
রচনা: গুরুদাস ভট্টাচার্য্য
সুর সংযোজনা: নাজমুল হুদা
ধারা বর্ণনা: শাহজালাল রনি
প্রযোজনা: এ. এইচ. এম. মেহেদী হাছান

সন্ধ্যা

৬-২০ কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ বেতার বিবরণী
ধারণ ও উপস্থাপনা: মো. শাহজালাল
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফ.এম ৯২.০ মেগাহার্জ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-১৫ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা: মাসব্যাপী গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: মো. মইনুল ইসলাম
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৮-৩৫ স্বাধীনতার সুরে জাগ্রত বাংলা: স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান নিয়ে গ্রন্থণাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: রোকাইয়া জামান সিঁথি
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

৯-০৫ স্বাধীনতার অগ্নিবীণা:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থণাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: রুকাইয়া ইসলাম রূপা
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

দ্বিতীয় অধিবেশন

দুপুর

২-০৫ সেলুলয়েডে স্বাধীনতা:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবির গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: সেতু দে
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

২-৩০ মহান স্বাধীনতা প্রত্যাশা ও অর্জন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর,
অধ্যাপক ড. মো. সোহেল হাসান,
প্রফেসর শাহ মো. ইকবাল হোসেন
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বিকাল

৪-৪০ স্বাধীনতার সূর্যশিখা: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

সন্ধ্যা

৬-৩৫ বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-২০ অগ্নিঝরা মার্চ:
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাতুল ইসলাম নির্জন
সম্পাদনায়: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

৯-১০ স্বাধীনতা তুমি: কবিতার আবৃত্তির গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাদিরা জান্নাত রাখি
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

২য় অধিবেশন

সন্ধ্যা

৬-৩০ অগ্নিঝরা মার্চ:
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাতুল ইসলাম নির্জন
সম্পাদনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রসঙ্গকথা
সাক্ষাৎকার প্রদান: পুষ্টিবিদ ছাঈদা লিয়াকত
সাক্ষাৎকার গ্রহন: লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রসঙ্গকথা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বিকেল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রসঙ্গকথা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রসঙ্গকথা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. জোবায়েদ হোসেন পলাশ
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-০৫ স্বাধীনতার অমরগাঁথা: মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষনা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. আজহারুল ইসলাম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৯.৩০ মুক্ত প্রাণের গান: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা ও ধারা বর্ণনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
সুর সংযোজন ও সঙ্গীত পরিচালনা: উজ্জ্বল সিনহা
উপস্থাপনা: জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা ও লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকেল

৩-৩০ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষনা ও গ্রন্থনা: মো. আজহারুল ইসলাম
উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা ও মো. জসিম উদ্দিন
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর
প্রচার সময়
রাত ১-১৫ থেকে ২-০০ (ইউরোপ)
রাত ১০-৩০ থেকে ১১-৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
সূর্য রাঙ্গানো দিন
প্রামাণ্য প্রতিবেদন:
স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা
অংশগ্রহণ: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ
প্রতিবেদক: মামুন উর রশীদ
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ড. তারিক মনজুর
উপস্থাপনা: জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা ও ফয়সাল আহমেদ
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

External Service
6-30 PM & 7-00 PM: English 1st Transmission
11-45 PM & 1-00 AM: English 2nd Transmission
Goals Ahead from Scars of Blood
Song: Bangladesher Swadhinota Lokkho Praner Dan: Runa Laila
Documentary: Marching Ahead Since Independence
Our Socio-Economic Advancement
Interviewer: Ashik uz Zaman Sarker
Recitation of Poem: Ei Swahinota
Poet: Golam Kibria Pinu
Recited by: Mahmuda Akhter.
Song: Swadhinota Tumi Esechho Bole: Subir Nandi
Compiled by: Munshi Rafiqul Islam
Presented by: Shamim Khan
Produced by: Umma Farhana Hossain Shimu

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার: কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

সন্ধ্যে

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
আসর পরিচালনা: মীর নাসির আহমেদ নিউটন
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
আসর পরিচালনা: মুন্সী আবু হারুন টিটো
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্কতা

সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসের নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্ট বিশেষ করে অমিক্রন LF.7, XFG, JN.1 এবং NB.1.8.1 এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংক্রমণ প্রতিরোধে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্দেশনাসমূহ

- বারবার প্রয়োজনমত সাবান দিয়ে হাত ধুবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড)
- নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন
- আক্রান্ত ব্যক্তি হতে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরে থাকতে হবে
- অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না
- হাঁচি-কাশির সময় বাহু/টিস্যু/কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন
- জনসমাগম এড়িয়ে চলুন

সন্দেহজনক রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয়

- অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন, মারাত্মক অসুস্থ হলে নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন
- রোগীর নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে বলুন
- প্রয়োজন হলে আইইডিসিআর এর হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করুন (০১৪০১-১৯৬২৯৩)

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মি.	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মি.	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৪-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যা ৬-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মি.	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রাম
বেলা ১-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৫-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মি.	ঢাকা	

স্থানীয়/আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-০৫	৫ মি.	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ৯-৩৫	৫ মি.	কক্সবাজার
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মি.	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-০৫	৫ মি.	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	রাজশাহী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মি.	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মি.	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-৩০	৫ মি.	কক্সবাজার
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মি.	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মি.	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মি.	রাঙ্গামাটি

স্থানীয়/আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
বাংলা	বিকাল ৪-৩০	৫ মি.	গোপালগঞ্জ
ইংরেজি	বিকাল ৪-৩০	৫ মি.	কক্সবাজার
বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মি.	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মি.	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, গোপালগঞ্জ
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকাল ৫-০৫	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যা ৬-৩৫	৭.৫ মি.	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-৪৩	৭.৫ মি.	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মি.	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মি.	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

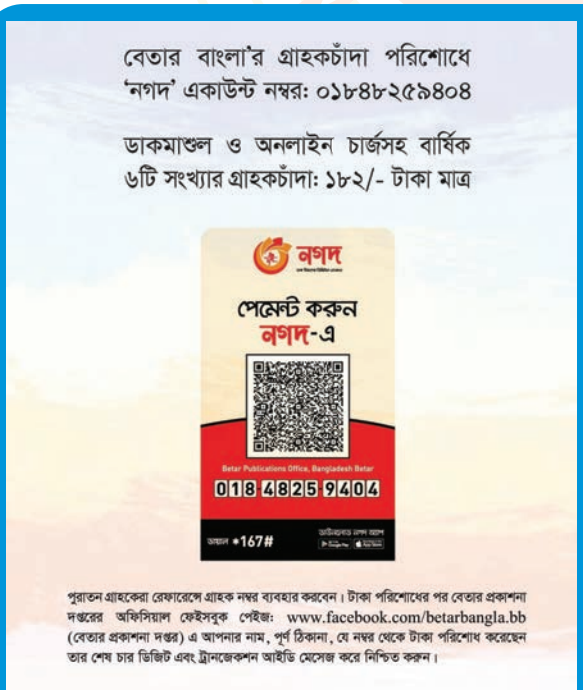

বেতারবাংলা'র
গ্রাহক হোন

বাংলাদেশ বেতারের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের সময়সূচি

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
ঢাকা	ঢাকা-ক: ৬৯৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
	ঢাকা-খ: ৮১৯ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	ঢাকা-গ: ১১৭০ কিলোহার্জ		১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১৯:০০	১২:০০	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		১৪:০০ - ২৩:০০	৯:০০	
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	বিবিসি	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০	
		বিবিসি	১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০	
		নিশুতি	২৩.০০ - ৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	এএম - ৬৩০ কিলোহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০	
চট্টগ্রাম	এএম - ৮৭৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ১০৩ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
রাজশাহী	এএম - ৮৪৬ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০	
			১৪:০০ - ১৪:৩০	০০:৩০	
			১৬:০০ - ২৩:১২	৭:১২	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
খুলনা	এএম - ৫৫৮ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
খুলনা	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১৪:০৫	৮:০৫	যান্ত্রিক সমস্যার কারণে সম্প্রচার বন্ধ আছে
			১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
			১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ -২৩:১৫	৩:৪৫	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
রংপুর	এএম - ১০৫৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০	
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ		১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
			১৮:২০ - ২৩:০০	৪:৪০	
সিলেট	এএম - ৯৬৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১০:০০	৩:০০	
			১৯:০০ - ২৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
বরিশাল	এএম - ১২৮৭ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
			১৪:৫৫ - ১৫:৫৫	৮:২০	
			১৫:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
ঠাকুরগাঁও	এএম - ৯৯৯ কিলোহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
			১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
			১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
রাঙ্গামাটি	এএম - ১১৬১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
কক্সবাজার	এএম - ১৩১৪ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
কুমিল্লা	এএম - ১৪১৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০	
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
বান্দরবান	এএম - ১৪৩১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
গোপালগঞ্জ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
ময়মনসিংহ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	ইংরেজি	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০	
		নেপালি	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০	
		হিন্দি	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০	
		আরবি	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০	
		বাংলা	২২:৩০ - ২৩:৩০	১:০০	
		ইংরেজি	২৩:৪৫ - ০১:০০	১:১৫	
		বাংলা	০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫	

বেতার সংবাদ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
'শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়

বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক আয়োজিত বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বেতারের আয়োজনে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় অবস্থিত রেডিও কলোনি মাঠে ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ একটি বাহরাঙ্গন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এই বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠানের উদ্যেশ্য বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে এবং সমাজে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীর জন্য সমতা সৃষ্টিতে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। এর পাশাপাশি আসন্ন গণভোট ২০২৬ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান ও গণভোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য তাঁদের উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক কমিউনিটি পর্যায়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. ইয়াসিন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও প্রকল্প পিরচালক, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ। অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্ব সঞ্চালন করেন বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় নতুন বাংলাদেশকে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিতে তারুণ্যের শক্তিকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতার অনুশীলনের উপর জোর দেন। পাশাপশি গণভোট ২০২৬ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-এ ভোট প্রদানের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। বাংলাদেশ বেতার এর স্টুডিও কেন্দ্রিক সম্প্রচারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রণে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীর অধিকার বিষয়ক গণসচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ তার বক্তব্যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে এবং সমাজে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীর জন্য সমতা সৃষ্টিতে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন।

আলোচনা পর্বের শেষে সাংস্কৃতিক অনাষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বোংলাদেশ বেতারের প্রথিতজশা শিল্পীবৃন্দ। রেডিও কলোনি ও পার্শবর্তী এলাকা হতে আগত দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রে

গণভোট বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম অনুষ্ঠান

গণভোট বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর-এর উদ্যোগে গত ২০ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. বিকাল ৪.০০টায় রংপুর টাউন হল শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে একটি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের উপমহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) এস.এম. আবুল হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জয়নাল আবেদীন এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক মো. আব্দুর রহিম।

বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে গণভোটের তাৎপর্য, জনগণের ভূমিকা এবং গণভোটে সচেতনভাবে অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। একই সঙ্গে গণভোট সংক্রান্ত প্রচারণায় গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আলোচনা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে এ অঞ্চলের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ নির্বাচন বিষয়ক সচেতনতামূলক গান-সহ অন্যান্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার ফাঁকে ফাঁকে গণভোটে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ এবং গণভোটে ভোট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বার্তা প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে

গণভোট ও নির্বাচনে বাংলাদেশ বেতার শীর্ষক কমিউনিটি ব্রডকাস্ট

গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ এ ভোটকেন্দ্রে যাওয়া, ভোট প্রদান ও গণভোটে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে গত ২১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে গণভোট ও নির্বাচনে বাংলাদেশ বেতার শীর্ষক কমিউনিটি ব্রডকাস্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) ড. আ.ন.ম বজলুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ড. মো: জিল্লুর রহমান এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক পরিচালক কিশোর রঞ্জন মল্লিক। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন- 'ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরেন।' অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্রের পরিবর্তনের জন্য গণভোটে ভোট দেয়া কেন প্রয়োজন তা তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী বেতারের শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বেতারের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ঘোষক-ঘোষিকা, সংবাদ পাঠক, অনিয়মিত শিল্পী, কথক, শিল্পী, শ্রোতা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপপরিচালক ইফফাতুর রহমান এর ইন্তেকাল

বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের উপপরিচালক ইফফাতুর রহমান ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল আনুমানিক ৭টা ৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪৭ বছর।

জনাব ইফফাতুর রহমান ৩০তম বিসিএস (তথ্য) সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ২০১২ সালে সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) পদে বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবানে যোগদান করেন। এর পূর্বে তিনি BRAC Bank ও পরে NSI তে চাকুরি করেন।

ইফফাতুর রহমানের জন্ম ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮ সালে, ভৈরবপুর (মধ্যপাড়া) ছাবর আলী হাজীর বাড়ীতে। তার পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুর রহমান সানু মিয়া এবং মাতা আয়েশা রহমান। পাঁচ বোন ও এক ভাই এর মধ্যে ইফফাত পঞ্চমতম। শৈশবে তিনি ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় খুবই ভালো ছিলেন। তাছাড়া সাঁতার কাটা, বই পড়ায় তাঁর বেশ আগ্রহ ছিলো।

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ভৈরবপুর আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরবর্তীতে ভৈরব কে বি পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি পাশ করেন। হাজী আসমত আলী সরকারি কলেজ,

ভৈরব থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ হতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

২০২৫ সালের জুলাই মাসে তিনি উপপরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী রিফাত হোসেন (সুমি) ও ছেলে আবদুর রহমান আদন ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান।

বাংলাদেশ বেতার মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

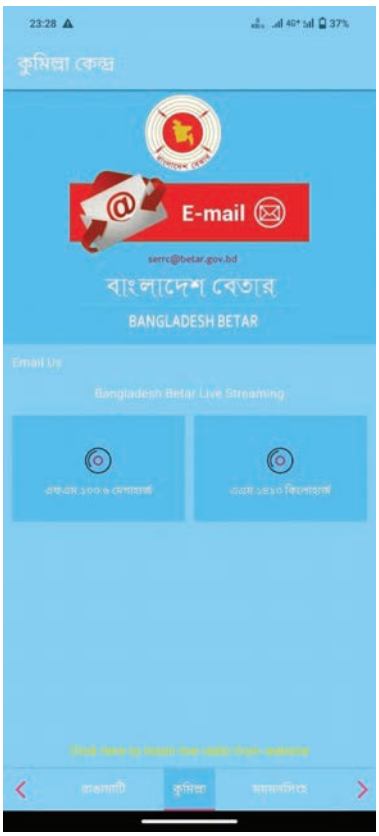

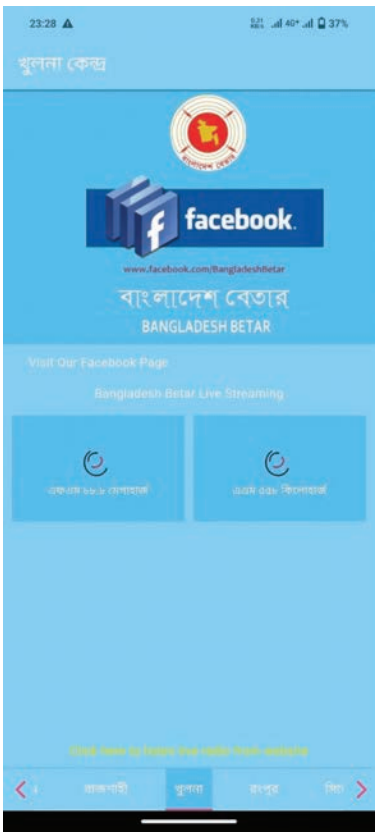

বেতার অ্যালবাম

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরিচালক (বার্তা) মো. আবু আলম-এর অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা ঢাকায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষ্যে ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ফটোসেশনে অংশ নেন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ এর ফলাফল সরাসরি সম্প্রচার বুথে কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ এর ফলাফল সরাসরি সম্প্রচার বুথে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ এর ফলাফল সরাসরি সম্প্রচার বুথে বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী মুনীর আহমদ ও ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক মো. বশির উদ্দিন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ এর ফলাফল বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার বুথ হতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়

'নির্বাচন ২০২৬: তরুণ ভোটারদের প্রত্যাশা', গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনকে বিসিএস তথ্য বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর ড. মোহাম্মদ আলতাফ-উল-আলম এর হাতে শাভেচ্ছাস্মারক তুলে দেন বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক মো. বশির উদ্দিন

প্রিয় স্বাধীনতা

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ চালায় ওরা গুলি,
বুকের পাঁজর ঝাঁঝরা করে উড়ায় মাথার খুলি।
রাতটা তখন অনেক গভীর সবাই ঘুমের ঘোরে,
আকাশ-বাতাস কাঁপন ধরায় শব্দ ছোটায় জোরে।

মায়ের বুকে কান্না জমে বাবা পাথর শোকে,
বোনের মুখের ভাষা বোবা তাকায় নীরব চোখে।
রক্ত গড়ায় স্রোতের ধারায় লালরঙা হয় নদী,
খুনি শাসক চালিয়ে হুকুম আঁকড়ে রাখে গদি।

হঠাৎ ধকল সামলে নিতে একটু সময় লাগে,
ক্ষোভের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, বীরজনতা জাগে।
ভয়-ভীতিকে তুচ্ছ করে সামনে সবাই ছোটে,
আশার আলোর রেখা তখন ফুটতে থাকে ঠোঁটে।

অটুট সাহস মনের মাঝে শক্ত করে গাঁথা,
যুদ্ধ শেষে মুক্ত হলো প্রিয় স্বদেশ মাতা।
চলল লড়াই পাকির সাথে ন'মাস পুরো টানা,
সাগর সমান রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনা।

শচীন্দ্র নাথ গাইন
চাঁচড়া, যশোর

একুশের কবিতা

একুশের গাথা বেদনাবিধুর কাহিনির মনিহার
একুশের গানে স্বজন হারানো হৃদয়ের হাহাকার।
একুশ আমার প্রাণের রুধিরে লেখা এক ইতিহাস
একুশ আমার শাশ্বত বোধ চিরায়ত বিশ্বাস।

একশ আমার মায়ের ভাষার অবিশ্বাস্য জয়-
একুশ আমার শেখালো কখনো মাথা নিচু করা নয়!

সালাম রফিক জব্বার অহি বরকত শফিউর
বীর শহিদেরা আমার কণ্ঠে দিয়েছে অমর সুর।
সেই সুরে আমি গাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকজ গান
সে গান আমার সাহসী হওয়ার মন্ত্রণা অফুরান।
সে গান মাতৃভাষার–
সে গান আমাকে স্বপ্ন দেখায়, সে গান দুঃখনাশার।

একুশ আমার কথা–কবিতার বর্ণমালার দোলা
একুশ আমার মুক্ত আকাশ উচ্ছ্বাস প্রাণখোলা।
মায়ের শাড়ির স্নেহের আঁচল, ভালোবাসা অনিবার
কোকিলের কুহু,রাখালিয়া বাঁশি জোনাকিরা সন্ধ্যার।

একুশ আমার প্রাণের আকুতি, সুখের স্বপ্ন দেখা
একুশ নিয়েই আমার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা।

অপু বড়ুয়া
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

অমর একুশে

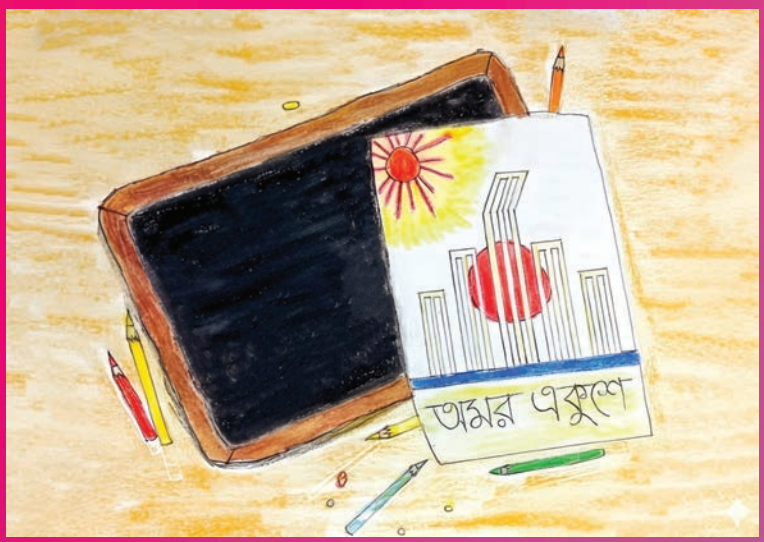

সকাল থেকেই আরিয়ানের ব্যস্ততার শেষ নেই। স্কুলের প্রতিযোগিতায় ছবি জমা দিতে হবে, তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে সে ছবি আঁকায় মগ্ন। বিষয় একুশে ফেব্রুয়ারি।

সাদা আর্ট পেপারে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো শহিদ মিনার আর তার পেছনে টকটকে লাল সূর্য। ছবিটা শেষ করে আরিয়ান নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল। বিভিন্ন রংয়ের মিশেলে ছবিটা দারুণ হয়েছে। সে মোটা কালির মার্কার পেন দিয়ে ছবির নিচে গোটা গোটা অক্ষরে লিখলো অমর একুসে।

ছবিটা হাতে নিয়ে দৌড়ে সে দাদুর ঘরে গেল। জানলার ধারে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন দাদু।

'দাদু, দেখো তো ছবিটা কেমন হলো?'

দাদু নাকের ডগায় চশমাটা ভালো করে এঁটে ছবিটা হাতে নিলেন। তার মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

বাহ! খুব সুন্দর হয়েছে দাদুভাই। রংগুলো খুব ফুটেছে। কিন্তু...

আরিয়ান উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো,

কিন্তু কী দাদু?

দাদুভাই, তুমি তো 'একুশ' বানানটা ভুল করেছো। ওটা তালব্য 'শ' হবে, তুমি দন্ত 'স' লিখেছো।

আরিয়ান কিছুটা অবহেলার সুরেই বললো,

তাতে কী? উচ্চারণে তো খুব একটা তফাত নেই। এটাও স, ওটাও শ। টিচার ঠিক বুঝে নেবে। আজকাল সবাই এভাবেই লেখে, এত বাছাবাছির কী আছে?

দাদুর মুখের হাসিটা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে আরিয়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে কাঠের আলমারিটা খুললেন। সেখান থেকে বের করে আনলেন একটা বহু পুরনো, ফাটল ধরা স্লেট। স্লেটটার কাঠের বর্ডার কালচে হয়ে গেছে, এক কোনায় একটু ভাঙা।

আরিয়ান অবাক হয়ে বললো,

এটা কী দাদু? এত পুরনো ভাঙা স্লেট দিয়ে কী হবে?

দাদু স্লেটটা খুব যত্ন করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার গলাটা সামান্য কেঁপে উঠলো,

এটা শুধু একটা স্লেট না, দাদুভাই। এটা একটা ইতিহাস।

আরিয়ান কৌতূহলী হয়ে দাদুর পাশের খাটে বসলো। দাদু বলতে শুরু করলেন,

সালটা ১৯৫২। আমার বয়স তখন তোমার চেয়েও কম। মাত্র অ-আ-ক-খ লিখতে শিখছি। আমার বাবা, মানে তোমার বড়দাদু খুব শখ করেছিলেন, ছেলেকে নিজের হাতে সুন্দর করে বাংলা লেখা শেখাবেন।

দাদু একটু থামলেন, চশমার আড়ালে তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

দিনটা ছিলো একুশে ফেব্রুয়ারি। বাবা বাজারে গিয়েছিলেন আমার জন্য এই স্লেটটা কিনতে। কিন্তু সেদিনই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় তুমুল আন্দোলন। ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালো। সেই মিছিলে তোমার বড়দাদু যাননি, তিনি ফিরছিলেন স্লেটটা নিয়ে। কিন্তু পুলিশের একটা গুলি এসে লাগে তার পায়ে।

আরিয়ান শিউরে উঠলো, তারপর?

রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো রাস্তা। কিন্তু বাবার জ্ঞান ছিলো। লোকজন যখন তাকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এলো, তখনও তিনি এই স্লেটটা বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বলেছিলেন, 'আমার রক্তমাখা এই স্লেটেই আমার ছেলে তার মাতৃভাষা লেখা শিখবে।'

দাদু স্লেটটা আরিয়ানের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

যেই ভাষার জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে, সেই ভাষার বানান ভুল করা কি আমাদের সাজে?

আরিয়ানের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। সে স্লেটটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মনে হলো, এখনো যেন ওতে রক্তের দাগ লেগে আছে। সে বুঝতে পারলো, বাংলার প্রতিটি অক্ষরের ওজন অনেক।

আরিয়ান মাথা নিচু করে বললো,

আমি বুঝতে পারিনি দাদু। আর কক্ষনো এমন ভুল হবে না।

আরিয়ান ভুল বানানের ছবিটা একপাশে সরিয়ে রেখে নতুন একটা কাগজ নিলো। এবার সে আরও যত্ন নিয়ে, আরও গভীর ভালোবাসা দিয়ে শহিদ মিনার আঁকলো। আর ছবির নিচে খুব সাবধানে, পরম মমতায় সঠিক বানানে লিখলো- অমর একুশে।

যেন প্রতিটি অক্ষর সে শুধু রং দিয়ে নয়, শ্রদ্ধা দিয়ে লিখেছে।

মির্জা রিজওয়ান আলম
রাজৈর, মাদারীপুর

শেষ আবেদন

আমি পাপী বান্দা হে প্রভু
জগতের লোভ লালসায় পড়ে,
ধ্বংস করিয়াছি আমার ঈমান।

যৌবনে করিয়াছি যত
নেক আমল এবাদত!
জগতের মোহতে পড়ে,
ধ্বংস করেছি তা সবে।

পুণ্য বিহীন অন্ধকার ঘরে,
শুয়ে আছি আমি একলা।

কি জবাব দিব প্রভু?
আমি ওই হাশরের মাঠে।

করিনি কখনো ন্যায় বিচার,
তোমার মানবের তরে।

করিয়াছি তবে অন্যায় অবিচার,
লুট রাহাজানির সবে।

বুঝিনি কখনো আমি,
খোলেনি আমার দুই নয়নের দ্বার,
পাপের মোহতে অন্ধ ছিলাম বলে।

ভুলে গিয়েছিলাম জগতে,
তোমার মানবের সেবা কিভাবে করে।

দিনশেষে সবাই ছিল,
মিছে মায়ার এই দুনিয়াতে ।

নিস্তব্ধ নিরালয় একা বসে
কাঁদিতেছি হে প্রভু আমি,
জলে ছলোছল আমার দুই আঁখি।

আমার পাপের বোঝা
ভাড়ি হয়েছে হে প্রভু,
ভাড়ি হয়েছে পাল্লাখানি ।

এত পাপের বোঝার,
ওজনের ভাঁড় কেমনে লইবো আমি।

ক্ষমার ভিক্ষা চাইতেছি হে প্রভু,
ক্ষমা করো তুমি আমারে।

দ্বীনের পথে চলি যেন
সদা সর্বদায় আমি,
হই না যেন পথভ্রষ্ট কভু আমি।
মৃত্যুর ডাক আসিলে আমার,
হয় যেন মৃত্যু আমার ঈমানের সহিত।

এই বলে করিলাম শেষ
আমার শেষ আবেদন,
করিবেন কবুল হে প্রভু তুমি আমার।

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

এলো খুশির ঈদ

আকাশ কোণে তাকিয়ে দেখা উঠল বাঁকা চাঁদ,
সবাই মিলে ভাগ করে নিই পরম আর্শীবাদ।
রঙিন সুখে সিক্ত আজ সবার ঘর-বাড়ি,
ঈদের হাওয়া বইছে মনে, ক্লান্তি দিল আড়ি।
ঈদ মানে তো নতুন পোশাক, প্রাণখোলা এক হাসি,
সবাই মিলে আনন্দের ওই জোয়ারে আজ ভাসি।
ধনী-দরিদ্র এক কাতারে, নেই যে ভেদাভেদ,
ঈদের দিনে মুছে যাবে মনের সকল খেদ।
বুক মিলিয়ে বন্ধু-স্বজন গাও খুশির গান,
খোদার দয়ায় জুড়িয়ে যাবে ক্লান্ত সবার প্রাণ।
অসহায়ের মলিন মুখে ফুটবে হাসি যখন,
ঈদের খুশি সত্যিকারে সার্থক হবে তখন।
হিংসা-বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে বন্ধুত্বের হাত ধরি,
খুশির রঙিন প্রদীপ জ্বেলে আঁধার বিবাদ করি।
বাঁকা চাঁদের জোছনায় আজ মিটল মনের সাধ,
সবার তরে রইল আমার 'ঈদ মুবারকবাদ'।

আব্দুল কাদের
সারিয়াকান্দি, বগুড়া

বসন্ত আজ দ্বারে

ফাগুন হাওয়ায় ঝরছে পাতা
শীতের প্রকোপ শেষ
গাইছে কোকিল মিষ্টি সুরে
কি মধুর আবেশ।

রং লেগেছে প্রকৃতিতে
ফুটছে কতো ফুল
শিমুল ডালে জ্বলছে আগুন
আম গাছে মুকুল।

অলির কাটে ব্যস্ত সময়
মানে না তো মানা
কোন কাননে কি ফুল ফোটে
সবই ওদের জানা।

কি অপরূপ সাজে এলো
বসন্ত আজ দ্বারে
এসো আমরা মহানন্দে
বরণ করি তারে।

এ কে এম মোস্তফা
কুমারখালী, পিরোজপুর

ফাগুনের ডাকে

ফাগুন আসে নীরব পায়ে, রঙের ঝুলি হাতে,
শিমুল-পলাশ আগুন হয়ে জ্বলে মাঠের ঘাটে।
দখিন হাওয়া কানে কানে প্রেমের কথা কয়,
মনটা যেন অকারণে আজ উড়তে চায়।

কোকিল ডাকে আমের বনে, সুরে মেশে রোদ,
কিশোরী আকাশ লাজুক হেসে
জড়ায় রঙিন শাড়ি গোধূলি- বোধ।
ধুলোমাখা পথের ধারে কাশফুল স্বপ্ন দেখে,
ফাগুন এসে জীবনের গান নতুন করে লেখে।
পুরনো সব দুঃখগুলো ঝরে শুকনো পাতায়,
নতুন দিনের আশা ফোটে রঙিন ফুলের ছায়ায়।
ফাগুন মানে হৃদয় জুড়ে অজানা এক টান,
ফাগুন মানে ভালোবাসার নরম অভিমান।

এসো তবে হাতটা ধরো, রঙ ছুঁই আকাশ,
ফাগুন এলেই মনে জাগে বাঁচার নতুন বিশ্বাস।

কাজী সালসাবিল পরোয়া

আজ ফাগুন

বনে বনে ফুলের আগুন
এসেছে আজ ফাগুন,
ফুল ফুটেছে রঙ বেরঙের
ভ্রমর করে গুনগুন।

দুর্বা উঠলো পাথর ঠেলে
চঞ্চুর মতো মেলে,
ঘরে বাইরে দক্ষিণ সমীর
যাচ্ছে নিত্য খেলে।

পাখি ডাকে শাখে শাখে
কোকিল ডাকে কুহু,
যুবা সাজে ফাগুন রূপে
পুষ্পের মতন হুবহু।

ন্যাড়া গাছে নতুন পাতা
আম্র গাছে মুকুল,
ফাগুন হল মাসের সেরা
প্রশান্তিতে অতুল।

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে নবনিযুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে নবনিযুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে নবনিযুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরীকে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

বেতারবাংলা রেজি: নং ডি-এ/৭ • বর্ষ ৫৩ • সংখ্যা-৭ • ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২